Madhu Ghosh.

Roll — 37

কাজল-লতা

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভারতী লাইব্রেরী
১৪৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা
ভারতী লাইব্রেরী
১৪৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য : আড়াই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

থমকে দাঁড়ালে প্রথমেই চোখে পড়বে সদর দরজার দেয়ালের গায়ে একটি পিতলের 'প্লেট্' আঁটা, তা'তে কালো হরপে লেখা একজন উকীলের নাম। বাড়ীটির মত নামটিও নতুন।

ঢুকতেই সুমুখে উঠোনে কয়েকটি ফুলের চারা। চাঁপা ফুলের গন্ধ ভুর ভুর করছে। উঠোনের কোলে রোয়াক, তার পাশেই দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। সিড়ি দিয়ে উঠেই ডান্ হাতি শোবার ঘর।

ঘরের আসবাবগুলি পরিপাটি ক'রে সাজানো; গৃহসজ্জাগুলি এমনিই নতুন যে এখনো ধূলিমলিন হয়নি। ওদিকে একটি গ্রামোফোন এদিকে একটি 'রেডিও' যন্ত্র। দেয়ালে চারটি সুন্দরী নারীর চিত্র। প্রত্যেকটি নারী এক একটি ঋতুকে প্রতিফলিত করছে। একটি সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন সমস্ত পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জাগুলির ভিতর থেকে যেন আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

বাঁ-দিকে ঘরের একধারে একখানি 'স্প্রীংয়ের' পালঙ্ক। পুরু গদি এবং তোষকের ওপর পরিষ্কার চাদর পাতা। তারই ওপর পা ছড়িয়ে একটি মেয়ের আধখানা দেহকে জড়িয়ে ধরে' একটি ছেলে শুয়ে রয়েছে। মেয়েটি কোন প্রতিবাদ করছে না। ঘরের দরজাটি ভেজানো।

রাস্তার দিকে দুটি জান্‌লাই খোলা। খোলা জান্‌লা দিয়ে অবসন্ন দিনের রক্তাভাস ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল।

মুখের উপর থেকে মুখ সরিয়ে সত্যেন বল্‌ল—আশ্চর্য্যি, তুমি মাটী না পাথর? গায়ে কি একটী ফোটাও রক্ত নেই?

অসংখ্য চুম্বনের কয়েকটা ভিজা দাগ সুলতার সমস্ত মুখখানার ওপর তখনো স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। বল্‌ল—হাঁপাচ্ছ কেন?

বর্ষায় ধোয়া মাটীর মত কোমল গা। সুদীর্ঘ চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়লে কালো আকাশের মেদুরতা মনে পড়ে। অন্ধকার দুটী চোখের তারা, বড় বড়—স্থির; পল্লবের গোড়ায় কাজলের রেখা টানা বলে সন্দেহ হয়।

দেখি?—বলে' তার মুখখানি এক হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সত্যেন বলল—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, সত্যি হাসির কথা নয়—চোখের পলক পড়লে মনে হয় যেন গভীর সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড একটী পাখী উড়ে যাচ্ছে! আর তোমার নিশ্বাস? তোমার নিশ্বাস নিয়ে কবিরা কবিতা লেখে,—হাস্‌চ? না সত্যি বলছি, তুমি কাজের লোককে অকেজো করে' দিতে পারো সুলতা! তোমার বুকের ওপর মাথা রেখে শুলে মনে হয়, মৌমাছি হলে আমি মরে' যেতাম!

বিবাহিতা স্ত্রী নয় তাই রক্ষে, নৈলে সত্যেনকে তিরস্কৃত হতে হতো। প্রেমের যে দুরন্তপনা সেটা সত্যেনের মধ্যে কিছু বেশী।

সমুদ্র না হোক, জল ত বটেই! জলে কোনো দাগ পড়ে না! না প্রেমের, না ঐশ্বর্য্যের, না বন্ধুত্বের। কিন্তু মনের একটী শান্ত মাধুর্য্য মুখখানিকে তার সর্ব্বদাই স্নিগ্ধ করে' রেখেছে। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় ভুক্তভোগী নরনারী তার মুখখানি একবার দেখলে শান্তি পেয়ে যেতে পারে।

ভিখারী এসে তার করুণ পরদুঃখকাতর মুখখানি দেখে ভিক্ষা নেবার কথা ভুলে গিয়ে খানিকক্ষণ আলাপ করে যেত। পৃথিবীর সকল রকম দুঃখের দিকে তাকিয়ে একটি সান্ত্বনাই তার মুখে আসত—আহা!

গাছ-পালা, বিড়াল-কুকুর, পাখ্-পক্ষী সবাই ছিল তার কাছে সমানই প্রিয়বস্তু।

সত্যেন বল্‌ল—যাবে? তাই চল যাই, কোনো পাহাড়ের চূড়োয় কিম্বা কোনো নদীর ধারে! না না, তার চেয়ে সুলতা, সাগরের তীরে গিয়ে থাকি—ঢেউয়ের পর ঢেউ আর তুমি, এই নিয়ে কাটাবো! লোকের ভিড়ে ভালবাসাকে বোঝা যায় না; তার চেয়ে মরুভূমি ভাল; প্রাণভরে সেখানে নিশ্বাস নেবো, পথহারাদের ছায়া দেবো—আচ্ছা, আমাকে ভালবাসো—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ-কথাটা একবার ভালো ক'রে বলতে পারো না?

সুলতা বাইরের দিকে তাকালো। কোনো কথাই তার মাথায় এলো না! বলবার মত কথা কি জীবনে তার কিছু জমা আছে? মন তার একেবারে নির্ব্বাক! সেখানে না আছে জোয়ার না আছে ঢেউ। যেমন সীমাহীন তেমনি শব্দহীন!

বললে— শুনে কি হবে?

কিছু না! পাখীর গান না শুনলে কি দিন যায় না? কিন্তু সারাদিন তোমার সাড়াশব্দ যদি না পাই তাহলে আমার কাজকর্ম্মের শক্তি যোগায় কে বল ত? তোমাকে আধমরা বলে' মনে হওয়া কি অন্যায়?

সুলতা মাথা হেঁট করে রইল—মুখখানি তার অল্পে অল্পে রাঙা হয়ে উঠেছিল। মানুষকে কেমন করে' আনন্দ দিতে হয় তা তার জানা

ছিল না। নিজের অক্ষমতা স্মরণ করে’ বেদনায় তার ভেতরটা টন্ টন্ করতে লাগলো।

তুমি মুখর হয়ে ওঠো—সত্যেন বলল—চঞ্চল হও, তুমি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে যাও, তোমার নাচের সঙ্গে মাটী কথা কয়ে উঠুক, আর আমি ভ্রমরের মত—

সুলতা চিবুকটা ধরে’ বল্‌ল—আবার ওই সব বল্‌চ? কী ও সব বলত?

প্রলাপ! প্রলাপ বলার খ্যাতি আমারই একচেটে! বিশেষ করে’ কোনো মেয়ের কাছে ওটা আমার খোলে ভাল! কিন্তু ক্ষমা করো সুলতা, তোমার আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে আমি পাগল হয়ে উঠি! —ওটা কি তোমার হাতে?

বড়দির চিঠি। এই একটু আগে এসেছে।

তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে সত্যেন পড়লো—

ভাই সত্যেন,

তোমার ও সুলতার প্রতি আশীর্ব্বাদের ভাষা আমার নেই। যে সৎসাহসে তুমি বিধবা সুলতাকে সঙ্গিনী করে নিয়েছ সেই আলো চিরদিন যেন তোমার মধ্যে উজ্জ্বল থাকে। তোমার প্রেরণায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এই অধঃপতিত সমাজ আজ থেকে এই উদারতাকে যেন বরণ করে’ নিতে পারে, তোমার গৃহ-প্রবেশের দিনে এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

সুলতাকে আমার ভালবাসা দিয়ে চিঠি লিখতে বলো।

ইতি—

তোমাদের দিদি

মাথা তুলে সত্যেন বলল—চিঠির একটা উত্তর লিখতে হবে, কি বল ?

সুলতা বলল—হবেই ত, আমিও লিখবো।

কি লিখবে তুমি ?

লিখবো যে,—তারপর আর কোন কথাই সুলতার মনে এল না।

সত্যেন হঠাৎ হো হো করে' হেসে উঠতেই সে ফিরে তাকালো ; বলল—বলে দাও না কি লিখতে হবে !

পাতলা দুখানি ঠোঁটের ওপর আর একটি গভীর চুম্বন বসিয়ে দিয়ে সত্যেন বলল—লিখে দাও যে তুমি একটী আস্ত বোকা !

সুলতা খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ কি যেন একটা আবিষ্কার ক'রে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো—ওঃ এবার ঠিক বুঝতে পেরেছি—ঠাট্টা !

তাই নাকি ? বুঝতে পেরেছ ? এবার একটু একটু করে' সবই বুঝতে পারবে ! ক্রমে বুঝবে গোলাপের চারা এনে কেন বাগানে বসিয়েছি, আমার বারান্দার দক্ষিণ দিক কেন খোলা, তারপর বুঝবে চাঁদের আলোয় রজনীগন্ধা কেন দুলে দুলে ওঠে। সুলতা, তুমি কথা যদি না বল ত চুপ করে' থেকো। আমি সকাল থেকে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের মধ্যে, সহস্র লোকের দেনা-পাওনার মধ্যে যে-গান মনে মনে তৈরী করবো, সেই গান সমস্ত রাত ধরে' তোমার কানে শোনাবো আর তুমি এলোচুল দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দেবে। কেমন ? উত্তর দাও ; পাপ ড়ি খোলো ?

সুলতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সত্যেন বলল—মনে তোমার দাগ যদি না পড়ে, চোখে তোমার যদি আনন্দ না ফেনিয়ে ওঠে, গা যদি না-ও রোমাঞ্চ হয়—না হোক,

আমাকে শুধু বলতে দিও! সুলতা, আমার ভালবাসা ফুটে ওঠে না, ফেটে ওঠে!

নিজের জীবন ও যৌবন সম্বন্ধে সুলতার কি কোনো চেতনা আছে? হয়ত নেই, অন্য কেউ হয়ত তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত না করলে সে আপনাকে ঠিক মত বুঝতে পারে না। নিজকে জানতে হলে অন্যের দ্বারস্থ হওয়াই যেন তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে বেঁচে আছে, এ কথা তাকে বারম্বার জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু সত্যেন তার জন্য অনেক করেছিল। লোকমতের আঁচ থেকে তাকে সর্ব্বদা রক্ষা করতে সে নিজকে বিপন্ন করতেও ত্রুটি করেননি, আপনাকে বিপন্ন করাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গায়ের রক্ত তার কোনো সময়েই ঠাণ্ডা নয়—তার মধ্যে যেমন চঞ্চলতা তেমনি আগুনের উত্তাপ। বাঁচবার মত বাঁচতে যদি না পারে ত সমারোহ করে মরণকে ডেকে আনতেও সে এতটুকু পশ্চাদ্‌পদ নয়। সুলতাকে ভালবাসার মধ্যেও তার একটী চমৎকার উদ্দামতা আছে। সে প্রেম যেমন অস্থির তেমনই নিত্য-নূতন। সে প্রবাহের মুখে কোনো শিলাই দাঁড়াতে পারে না—আপনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেও সে বাধাকে এড়িয়ে চলে যাবে।

স্বামীর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় সুলতার চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো।

সত্যেন্দ্রনাথ স্বামীর মত স্বামী। জীবনে যেমন আশাও তার অনেক, আকাঙ্খাও তেমনি বহুমুখী। বহু অর্থ উপার্জ্জন করবে, প্রচুর ভোগের

মধ্যে থাকবে, দুহাতে দরিদ্রদের দান করবে, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আনন্দ কোলাহল করবে, দাম্পত্য জীবনে একটি বড় প্রেমের তপস্যা করবে।

রাত্রে মাঝে মাঝে এই নিয়ে সুলতার কাছে সে অনেকক্ষণ বড় বক্তৃতা করে। সুলতা নিঃশব্দে একান্ত মনে তার কথাগুলি শুনে যায়। কথার উত্তর সে অতি কষ্টে যোগাতে পারে কিন্তু কথা আরম্ভ করার মত শক্তি তার ছিল না।

সত্যেন ক্লান্ত হয়ে চুপ করে। এক আধটা কথা অন্তত বলা উচিত এই মনে করে' সুলতা তখন বলে—কাল সকালে উঠেই ছবিগুলো টাঙিয়ে ফেলতে হবে। কেমন? ওই যেগুলো এনে রেখেছ!

হেসে সত্যেন বলে—এই নিয়ে তিনবার এই কথাটা শুনলাম।

না সত্যি, আর ওই কড়িকাঠে ভাল করে' আল্‌কাতরা লাগাতে হবে নইলে উইপোকা লাগতে পারে; তা ছাড়া ঘরের জান্‌লা কটায় পর্দ্দা লাগিয়ে না দিলে রাস্তার লোকজন,—আমার কিন্তু ভারি লজ্জা করে।

বেশ ত, কালই সে ব্যবস্থা করে' নিও!

একটু সাহস পেয়ে সুলতা বলে—রান্নাঘরটা কিন্তু বদল করে নেব! এ ঘরে ধোঁয়া ঢুকলে কিন্তু ভাল হবে না!—হঠাৎ গল্‌গল্ করে তার মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে আসে—আচ্ছা, ছাতের আল্‌সেতে যদি গোটাকতক ফুলের টব বসানো যায় তাহলে কেমন হবে?

আর এই ত তুমি বলেছিলে এটা আকাশ-পিদিমের মাস্তুল একটা আলো টাঙিয়ে দিও—কি বল?

সত্যেন বলে—হুঁ।

অপূর্ব্ব স্নেহের সুরে সুলতা বলে—ঘুমুলে বুঝি?

না, কেন বলতো?—সত্যেন চোখ খুলে তার দিকে তাকায়। দেখে

স্নেহে, প্রেমে, মাধুর্য্যে, আবেগে সুলতার সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—ওই বেলতলার ছাদটাও ঘিরে দিও। ছোট ছেলেপুলে ওখান দিয়ে পড়ে যেতে পারে। রাজমিস্ত্রি আর ছুতোর ডাকিয়ে,—কই সবুজ রঙের আলোর ডুম্ গোটাকতেক আনবে বলেছিলে যে? সাদা আলো সব সময় তোমার চোখে যে সয় না!

আপনার কথার আনন্দেই সর্ব্বাঙ্গ যেন তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল এই সরল, বিশেষত্বহীন, নির্ব্বোধ মেয়েটির মৃদু প্রগলভতা, ভীরু সঙ্কুচিত একটী পাখীর এই আকস্মিক কলকাকলী সত্যেনকে মুহূর্ত্তেই একেবারে মুগ্ধ করল। একটু হেসে বলল—বাজে কথা তোমার মুখে এমন চমৎকার শোনায়, ভালবাসার ভাষা তোমার মুখে যদি শুনতে পেতাম সুলতা!

তারপর আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সত্যেন তাকে কাছে টেনে নিল।

আহারে বসে সত্যেন একেবারে অবাক হয়ে যায়।—

এ কি, এ যে রাজভোগ, এত কি হবে?

সুলতা একপাশে বসে থাকে। বলে—এমন আর কি?

পাগল কোথাকার, আমি কি রাক্ষস?

দু'জনেই হাসে।

—পরিমাণে যে কোনটা বেশী তা বলছিনে, কিন্তু এত রকমের খাবার জোগাড় করতে মানুষকে অনেক বেগ পেতে হয়। একেবারে নিখুঁৎ কোনটা আগে খাই বল ত?

লজ্জায় সুলতা মাথা হেঁট করে' থাকে। হেসে, আনন্দে সোরগোল করে' সত্যেন খেতে সুরু করে' দেয়। প্রত্যেকটি আহার্য্যবস্তু আস্বাদন করবার জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে যে একটি মধুর অনুরোধ আসা উচিত, সত্যেন সেকথা একদম ভুলেই যায়; অনুরোধের ভাষা, নিকটতম

আত্মীয়তার ভাষা সুলতার মুখেও আসে না। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এমনিই যে একজনের আনন্দোচ্ছ্বাস আর অপর জনের নিঃশব্দতা—কেউ দাঁড়িয়ে দেখলে হঠাৎ কোনো রূঢ় মন্তব্য সুলতার প্রতি আস্‌তে পারে।

আহার কোনো রকমে শেষ করে' উঠে সত্যেন বলে—জান না বুঝি, মেয়েরা কেমন ক'রে মাথার দিব্যি দিয়ে স্বামীদের খাওয়ায়?—বলে' একটুখানি করুণ হাসি হেসে সে কলঘরের দিকে চলে যায়।

কাছারি থেকে ফিরে সবাই একটু ব্যস্ত ভাবে ঘরে এসে ঢোকে।

—পথ ছেড়ে একটু কোথাও সরে গিয়ে বসো দেখি সুলতা। পায়ে পায়ে ঘুরলে হয়ত তোমার লেগে যেতে পারে, যে গোঁয়ারের মত আমি হাত-পা ছুড়ছি।

ভীরু শশকের মত সুলতা একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এতবড় অপরাধ সে যেন আর কোনো দিন করেনি!

সত্যেন আর কিছু বলে না, শান্ত ভাবে নিজের হাতেই জামার বোতাম খোলে, মাথার টুপিটা হুকে টাঙিয়ে দেয়, পায়ের মোজা খুলে রাখে—তারপর একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে' দেখে—সরবৎ, জল-খাবার, পান, সিগারেট সবগুলি পাশাপাশি সাজানো।

হাসি আর সে চাপতে পারে না। বলে—দরকারি জিনিষ ত সবই পেয়ে গেছি, তবে আর তোমাকে দরকার কি!

তাই ত, এই সামান্য কথাটা এতক্ষণ তার মনে হয়নি! সে ত ভয়ানক বোকা!

—থাক্ থাক্, আমি যেতে বলিনি—তুমি যদি যাও, আহারের রুচিটাও চলে যাবে তোমার সঙ্গে। সুলতা, আজকাল কি তুমি অনুরাগ ছেড়ে রাগের মহলা দিচ্ছ?

একটুখানি থতিয়ে সুলতা একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বল্‌ল—রাতের জন্য আবার রান্নাবান্না—

সে ত রাতের কথা! পশ্চিম দিকটা এখনও রাঙা হয়ে রয়েছে, সন্ধ্যাতারা এখনও মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে—রাতের এখনও অনেক বাকি সুলতা!

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সত্যেন বল্‌ল—সামান্য মানুষ,সামান্য একটু আরামের জন্যে কাতর হয়ে পড়ি। যে ক'টা দিন বাঁচি, হেসে-খেলে হৈ-চৈ করে চলে যাবার ইচ্ছে।

দেখতে দেখতে সুলতার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো। মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল—এটা আমার সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ইচ্ছা করে এমন অন্যায়—

বলতে বলতে বড় বড় দু ফোঁটা চোখের জল তার গালের ওপর গড়িয়ে এল। সে এমনি মৃদু, এমনি ক্ষণভঙ্গুর!

সত্যেন কাছারিতে গেলে সুলতা সারাদিন তার কথা নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করে। কাজের চাপ থেকে এই মানুষটির যদি এতটুকু অবকাশ আছে! সত্যেন বলেছিল, আজকাল মক্কেলের ভীড় সমস্ত দিন ধরে তার ঘরে লেগেই রয়েছে। আচ্ছা দিনরাত একটা লোক যে তোমাদের কাজ নিয়েই আট্‌কে থাক্‌বে বাপু, এর পরিশ্রমটা কি তোমরা দেখতে পাও না? সত্যেন বলেছিল, মক্কেল কোনো কোনটা তার একেবারে ছ্যাচ্‌ড়ার একশেষ! সুলতাও ঠিক সেই কথা ভাবে—সবাই কি আর ভালো লোক হয়! কিন্তু এই মন্দ লোকগুলো কি একটু সরল প্রকৃতির হতে পারে না? এর জন্যে ত আর তোমাদের কষ্ট কর্‌তে হয় না বাপু, কিছু খরচ করতেও হয় না,—বরং এতে নিজেদেরই উপকার! সুলতার ইচ্ছা করে একবার ভাল করে' তাদের বুঝিয়ে দিয়ে আসে।

জানলার ধারটিতে বসে তাকে অনেক কথাই এমনি করে' ভাবতে হয়। আশ্চর্য্য, তার অভাবে এই আত্মভোলা মানুষটির কি করে' চলতো কে জানে! পথ দিয়ে যে এতগুলি লোক চলেছে, এদের একজনেরও অন্তর সত্যেনের মত উদার নয়! সত্যেন যেন এদের প্রত্যেকের মনুষ্যত্বটুকু ছেঁকে তুলে নিয়ে আপনার মধ্যে সঞ্চয় করে' রেখেছে।

জান্‌লার পথে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়ায় সুলতার চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত হয়ে আছে। মনে হয়, তার সমস্ত মন জুড়ে সত্যেন পদচারণা করে বেড়ায়। এই স্নেহপ্রবণ, উদার-হৃদয়, একনিষ্ঠ স্বামীটি ছাড়া জীবনে যেন তার আর কিছুই নেই। ভিতরে যতদূর পর্য্যন্ত নজর চলে, সত্যেনকে ছাড়িয়ে আর কিছুই তার চোখে পড়ে না! অন্তরের আকাশকে রূপে-বর্ণে আচ্ছন্ন করে' তার জীবনের যেন প্রথম সূর্য্যোদয় হয়েছে! সত্যেন তাকে আবৃত করেছে, মুগ্ধ করেছে!

আজকাল সুলতার লজ্জা একটু একটু ভেঙেছে। লজ্জার চেয়ে একটি ভীরু সঙ্কোচ বললেই শোনায় ভাল।

সত্যেন বাড়ী আস্‌তেই সে গিয়ে তার একটি হাত ধরে। হাত থেকে বই কাগজগুলি নামিয়ে নেয়; জামার বোতামগুলি খুলে দিয়ে আঁচল নেড়ে হাওয়া করে! জুতোর ফিতে খুলে দেয়। মাথার চুলগুলি সত্যেনের পায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে।

—ওকালতি করার মত পাজী কাজ আর দুনিয়ায় কিছু নেই, বুঝ্‌লে সুলতা!

সুলতা বলে—ঠিকই ত, আমিও ওই কথা ভাবছিলাম! ওকালতি করতে গেলে ভারি মিথ্যা কথা বলতে হয়।

শুধু তাই? পয়সা চাইলেই ব্যাটারা মাথা চুল্‌কে বসে।

ওই ত নিয়ম! একবার কাজ হয়ে গেলেই—বাস্। ফাঁকি দিতে পারলে কি কেউ ছাড়ে?

সত্যেন বলে—তুমি কি করে' এত জান্‌লে?

বড় বড় সরল দৃষ্টি তুলে সুলতা বলে—তুমিই ত বলতে!

আমি বলতাম! ও—আমার কথাই এখন বুঝি তোমার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

সুলতা আর কিছু বলে না, সরবতের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়!

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার ভঙ্গীটির প্রতি তাকিয়ে সত্যেন বলে—তোমাকে উদাসীন বলে' কতকটা ভুল করেছিলাম, আমায় ক্ষমা করো সুলতা!

তা বলে এত খেটে খেটে আমি তোমায় শরীর নষ্ট করতে দেবো না, তা আমি আগে থেকে বলে রাখছি।

সত্যেন করযোড়ে বলে—দেবি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

স্বামী তার কথা শুনেছেন—আনন্দে আবেগে সুলতা একবার জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর আবার সরে' এসে বলে—আমি বলছিলাম বরং—বরং তোমার কাজগুলো আমায় এনে দিও, তা বলে' আমাকে একবার দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে, নৈলে হয়ত ভুল করে' ফেল্‌বো—যে ভুল করা আমার অভ্যেস!

সত্যেন একটু একটু হাসছিল।

তা আমি পারি, দেখিয়ে দিলে অনেকেই পারে,—তা ছাড়া কিছু কিছু আমারও ত করে' দেওয়া উচিত। চুপ করে' বসেই ত থাকি!

সত্যেন কিছু বল্‌ল না, কেবল তাড়াতাড়ি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়টায় সত্যেনের একদিন জ্বর এল—

পীড়িত কোনো মানুষের দিকে তাকালে সুলতার বুক বেদনায় ভরে' ওঠে। আস্তে আস্তে সে স্বামীকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সত্যেন বল্‌ল—জ্বর সামান্যই, এর মধ্যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেল?

সুলতা বল্‌ল—ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি। এখুনি তিনি এলেন বলে'।

—এত অল্পেতেই ডাক্তার আনালে সুলতা?

সুলতা বলল্—ওকথা ব'লো না তুমি।

ডাক্তার এসে দাঁড়াতেই সুলতা তাঁর হাত ধরে' কেঁদেই অস্থির।

—বাঁচান্ ডাক্তারবাবু, আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান্?

ডাক্তারবাবু হেসে সুলতার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বললেন—কিছুই না, তোমার স্বামীর কোন রোগই নেই, সামান্য একটু সর্দ্দি জ্বর।—বলে' তিনি অন্য দিকে চেয়ে একটি প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন লিখে দিলেন।

চোখ মুছে সুলতা বলল—আবার কবে আসবেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার একটু হেসে বললেন—এরকম রুগী দেখার চেয়ে আমার দেশ ছেড়ে পালানো ভাল! কোনো দরকার নেই আমার আসবার, কেন মিছামিছি—মা তুমি ছেলেমানুষ, একটু বুদ্ধিমতী হও।—বলে তিনি হাসিমুখে আবার বেরিয়ে চলে' গেলেন!

সুলতা ঔষধ আনালো, থার্ম্মমিটার আনালো; আঙ্গুর-বেদানা আনতে বাজারে পাঠালো। তারপর রোগীর পক্ষে যতগুলি সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন, সবগুলি ভেবে ভেবে ফর্দ্দ করতে লাগলো।

সত্যেন একবার তাকিয়ে দেখলো, চোখ দুটি তার ফুলে উঠেছে।

রোগশয্যায় শুয়ে থেকে নিজেকে সে ধন্য মনে করলো। স্মিতমুখে শুধু বল্‌ল—চমৎকার!

কাছে এসে সুলতা বল্‌ল—ভাল হয়ে যাবে, ভয় কি?

সত্যেন শুধু বল্‌ল—যে পরিশ্রম, দিন কয়েক শুয়ে থাকতে পারলে মন্দ হয় না!

সুলতার চোখে আবার জল এল। বল্‌ল—আমার অন্যায়তেই তোমার এই হয়েছে! তোমার ঠাণ্ডা লাগছে, খাওয়া দাওয়ার যত্ন নেই, সময় মত আমি যদি একথা বলতাম তা হলে আর এমন,—আমায় তুমি মাপ কর!—বলতে বলতে শিশুর মত সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। এ যেন তারই পাপ!

জ্বর অবশ্য সত্যেনের একটু বেশীই হলেছিল। চোখ লাল, মাথা ভার, একটু কাস। সুলতার স্নানাহারের আর সময় ছিল না। সমস্ত দিন ধরে' সেবা-যত্নে তার আর ক্লান্তি নেই। নিকটেই কোথায় গয়লা পাড়া খাঁটি দুধের জন্য প্রাতঃকালে গায়ে-মাথায় মুড়ি দিয়ে সে দুধ আনে। আঙ্গুর, বেদানাগুলি নিঙ্‌ড়ে রস বার করে। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে মেপে মেপে ওষুধ ঢালে। তা ছাড়া যখনই দেখো তখনই সে কাছে বসে স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে; নয়ত বাতাস করছে; নয়ত' কিছু খাওয়াচ্ছে,—কিছু না হোক অন্তত নিঃশব্দে চোখের জলও ফেল্‌ছে! রাত্রে সে নিদ্রা ত্যাগ করেছে! সারারাত্রি সে জেগে শিয়রে বসে থাকে। এক-একবার তন্দ্রা এলে সে আবার চম্‌কে ধড়মড় করে' সোজা হয়ে বসে।

এমনি করে' আপনার সমস্ত তপস্যা, নারীত্বের মহিমা, অন্তরের প্রীতি, ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-সুখ, আদর্শ একনিষ্ঠতা—সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নিবেদন করে' আপনাকে সে সার্থক মনে করতে লাগলো।

সত্যেন কয়েক দিন পরে যেদিন একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলো—একটু দুর্ব্বল হলেও চেহারা তার ফিরে গিয়েছিল। রোগশয্যা যেন তার তীর্থ-ক্ষেত্র, যখন উঠে এল তখন তার উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে।

বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও সুলতা তাকে ধরে' ধরে' বাইরে আনে! একান্ত স্নেহে তাকে সদা-সর্ব্বদা সাবধানে রাখে। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও এখনও তার কাছারীতে বেরোবার হুকুম নেই। ঘড়ির কাঁটা ধরে' এখনও তাকে স্নানাহার করতে হয়।

ক'দিন পরে সুলতার মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে সত্যেন থম্‌কে দাঁড়ালো। একটি মনোরম মালিন্যের ছায়া যেন তাকে ঘিরেছে! চোখ দুটি একটু অলস, দৃষ্টি যেন শ্রান্ত; কৃশ তনু—অপর্ণার মত তপঃক্লিষ্টা!

দেখ্‌ছ যে? কি?

সত্যেন একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌ল—অনেক দিন ধরে তোমাকে কেবল একটি কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি সুলতা! আমি তোমাকে ভালবাসি। বল, সত্যি নয়?

সুলতা তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সমস্তটাই জানিয়ে দিল।

সেদিন সন্ধ্যার আকাশে কেন যে কুয়াসা ছিল না কে জানে! একটা বড় সুপুরি গাছের পাশ দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে বারান্দার একটা ধারে পড়েছিল। সমস্ত আকাশটায় তারা ছড়িয়ে রয়েছে!

সত্যেন এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, এবার বল্‌ল—দেখেছ সুলতা, দিনের বেলা এত আলো, এত গোলমাল কিন্তু রাতের বেলা চাঁদ ওঠে! রাতে মনে হয় দিনটা মিথ্যে, আর দিনের আলোয় রাতের কথা ভাবলে হাসি পায়—আশ্চর্য্য নয়?

সুলতা বল্‌ল—তাইত, আমিও ভাবি!

একটু থেমে সত্যেন বল্‌ল—আজ দিনের বেলা একটা কথা ভেবে হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সন্ধ্যে হতেই সেটা যেন নেশার মত মনটাকে পেয়ে বসেছে! মানুষের মন ভারি আশ্চর্য্য জিনিস সুলতা!

কি বল ত? আচ্ছা বলই না কি? আজকাল ত তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি। পারিনে?

তোমাকে শোনাবার মত যদি না হয়?

আমাকে শোনাবার মত নয়? চোর-ডাকাতের কথা বুঝি?—বড় বড় চোখে সুলতা তাকালো।

সত্যেন হাসতে লাগলো। সুলতা তার হাতটি ধরে' বল্‌ল—তা হোক, বল। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তাদের কোনো দুঃখের কথা বলবে। তা ছাড়া তোমার কথা কি আর আমার কাছে চেপে রাখতে পারবে?

সত্যেন বল্‌ল—ঘুমের ঘোরে আজ বহুকালের একটা পাগলামীর কথা ভাবছিলাম। স্বপ্ন ঠিক নয়, যেই যেথানেই হারায়, আমার মন অমনি সেটাকে ভরাট করে' দেয়। অনেক দিন আগে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বহুদিন ধরে দুজনে মিলে নানা জল্পনা করেছি, কোনো দূর দেশে গিয়ে বিয়ে করব, তাও ঠিক করেছিলাম···কিন্তু রাস্তার ধারে একদিন দাঁড়িয়ে দেখলাম তাদেরই বাড়ীতে আগে শানাই বেজে উঠলো, মেয়েটা হাসতে হাসতে গেল শ্বশুরবাড়ী। তা যাক্, এমন ত সংসারে নিত্যই ঘটছে! আমিও হাসতে হাসতে জীবন-সংগ্রামে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আজ দুপুর বেলা স্বপ্নে দেখি—

সুলতা তার মুখের দিকে তাকালো।

দেখলাম হায়রে, তার চোখের মধ্যে এত বর্ষা কোথায় জমা ছিল ? সে যে একেবারে প্লাবন ! প্রথম ভালবাসাই বোধ হয় জীবনের সব চেয়ে বড় স্মৃতি ! ঘুমের ঘোরে আমিও যে ফুঁপিয়ে উঠছিলাম তা ত আর অস্বীকার করতে পারিনে ! মেয়েটাকে দরিদ্র বলে' মনে হল না, শোকাতুর বলেও মনে হল না, মনে হল তার পাঁজরের মধ্যে একটা তীর বিঁধে রয়েছে, দর্ দর করে' রক্ত গড়াচ্ছে, মুক্তি পাবার জন্যে সে যেন ছটফট করছে ! কিন্তু আশ্চয্যি, আমিও জানতাম না যে আমি এত দুর্ব্বল ! আমি এমন হিসেবী লোক হয়েও সেই অসম্ভবের জন্য যে কাঁদতে পারি, একথা কি জানতাম ? সুলতা, ঘুমের মধ্যে আমরা আমাদের আসল মানুষটির খোঁজ পাই !

সুলতা সাড়া দিল না !

সত্যেন বলল—কিন্তু সেই মেয়েটার দিক থেকে কি কোন হদিস পাওয়া যেতে পারে ? আচ্ছা সুলতা, তোমার প্রথম স্বামীর সম্বন্ধে কি মনে হয় বলবে ? ও কি, কাঁদচ কেন ? যাক্ আমার পুরাণো প্রেমের কাহিনী এবার সত্যিই সার্থক হলো !

তারপর ঝোঁকের মাথায় আবার সে জিজ্ঞাসা করে বস্‌লো—আমার কথার উত্তর দেবে না, সুলতা ?

সুলতা বলল—তাঁর কথা আমি বলতে পারিনে !

বেশ ত, তোমার কথাই বল। না না, এতে লজ্জার ত কিছু নেই ! তা ছাড়া আমার মতন ত আর নয়, তুমি যে তার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলে !

সজল মৃদুকণ্ঠে সুলতা বলল—তিনি ছাড়া আর আমার কেউ ছিল না ! আমাদের দুঃখুও ছিল না, অভাবও ছিল না ! তাঁর মত ভালমানুষ আমি সত্যিই কোথাও দেখিনি !

কোথাও না ?

দীর্ঘ নিশ্বাসের আবেগে সুলতার গলা কেঁপে উঠছিল। বলল—না আমি তেমন আর কোথাও দেখিনি!

আচ্ছা, তিনি তোমায় খুব ভালবাসতেন—না?

হুঁ, তিনি কোথাও থাকতেন না আমায় ছেড়ে।

পশ্চিমের চাঁদ, পশ্চিমেই হেলে পড়েছে। উত্তরের হাওয়ায় সুপুরি-গাছের পাতাগুলির মধ্যে সর্ সর করে শব্দ হচ্ছিল। একটা ঠিকা-গাড়ীর শব্দ নিকট থেকে দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল।

সত্যেন একটু নড়ে' চড়ে' সাগ্রহে গলা বাড়িয়ে বলল—আর তুমি? তুমি তাঁকে ভালবাসতে না?

সুলতা কেঁদে বলল—আমি মেয়েমানুষ, তাঁর সেই ভালবাসার জন্যে আমি কতটুকু—

তা নয়, তুমি ভালবাসতে কিনা তাই বলছি।

সুলতা বল্ল—তিনি ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না! কত কাঁদলাম, ঠাকুরের পায়ে কত—

সে হয়ত' আত্মহারা হয়ে বলেই চলতো তার পূর্ব্ব-স্বামীর কথা, কিন্তু হঠাৎ সত্যেন বাধা দিয়ে বলল—ও—বুঝেছি।—বলতে বলতে সে মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ব্যস্তকণ্ঠে পুনরায় বলল—সব অন্ধকার যে! নাঃ সুলতা, তুমি আজকাল কিছুই দেখো না! মাথাটা বোধ হয় একটু—না, না, তা বলে' জ্বর নয়, আমি বেশ আছি। বরং একা একা একটু বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি।

প্রায় টল্‌তে টল্‌তে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বিছানার ওপর বসে' তার মনে হলো, নিজের হাত-পা-মুখ সর্ব্বাঙ্গ যেন অতিরিক্ত কুৎসিত হয়ে উঠেছে! একটা তীব্র জঘন্য দুর্গন্ধে যেন এই সুসজ্জিত ঘরখানি ভরা। ঘরের ভেতরকার এই বিচিত্র ঐশ্বর্য্য, চারিদিকের এই বহুমূল্য আসবাব, সবগুলি যেন তাকে অচ্ছেদ্য পাশে আবদ্ধ করেছে; বন্দী করেছে!

দুই

অভিশপ্ত বন্দীর চোখে রাত্রি যেমন করে কাটে।

হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতরের বিচিত্র ঐশ্বর্য্যের বন্ধনের মধ্যে বসে সত্যেন যেন অঞ্জলি ভরে' অপরিমিত পরিমাণে আকণ্ঠ বিষপান করে উঠল। সমস্ত দেহের রক্তে সে বিষ ছড়িয়ে গিয়ে প্রতি রোমকূপ তার জ্বালা করতে লাগল।

স্নুলতাকে আলো হাতে ভেতরে ঢুকতে দেখেই সে তাড়াতাড়ি উঠে সোজা ছাতের দিকে চলে গেল, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সে খানিকক্ষণ পায়চারি করতে লাগল। চারিদিকের এই দিগন্তজোড়া অন্ধকার কৌটার মধ্যে বায়ুরুদ্ধের মত হাঁ করে একবার নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করল, আপনার বুদ্ধিহীনতার জন্য নিয়তির বিরুদ্ধে একবার চীৎকার করে' উঠতে চাইল— কিন্তু তার সে উত্তেজনার কোন প্রকাশ ছিল না। তার যন্ত্রণা ছিল, বেদনা ছিল, পীড়ন ছিল, কিন্তু মুক্তি ছিল না।

রাত্রি গেল সকালের দিকে গড়িয়ে—পূর্ব্বাকাশের সীমায় লাল-নীল রেখা ফুটে উঠে সূর্য্যোদয়ের আভাস জানিয়ে দিল।

রোদ উঠল; সকাল গড়ালো দুপুরের দিকে। সত্যেন তখনও নিশ্চল-নিঃশব্দ একখণ্ড পাথরের মত দাঁড়িয়ে। স্নুলতা নির্ব্বাক বিস্ময়ে গত রাত্রি থেকে স্বামীকে লক্ষ্য করছিল; এবার আর থাকতে পারল না, পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—আজ তাড়াতাড়ি কোথা যাবার কথা ছিল যে?

ঘাড়টা একটুখানি কাৎ করে হাসির একটি চেষ্টা মুখের মধ্যে এনে সত্যেন বলল—তাড়াতাড়ি আর নয়, এবার একটু আস্তে আস্তে— বুঝলে?

আধখানা চেহারা যেন তার আগুনে পুড়ে গেছে। কেন তা সুলতা কিছুই বুঝল না, অপরিসীম মমতায় তার চোখ দুটি হঠাৎ একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ও-ঘর থেকে একটি রেকাবিতে কিছু ফলমূল ও মিষ্টান্ন সাজিয়ে এনে পরম যত্নে সে সত্যেনের কাছে ধরল। বলল—রাতে কাল কিছুই খাওনি—হাত ধোবার জল দেবো?

রেকাবি রেখে সে জল আনল।

সত্যেন বলল—তুমি খুব সরল, না সুলতা? ওটা বোকামি আর ন্যাকামি দুই। মানুষের সরলতা যে কত বড় বিপদ আনে তা তুমিই দেখালে। থাক্—বলে সে আপাদমস্তক সুলতার প্রতি একবার তাকিয়ে পুনরায় বলল—খেতে রুচি আর নেই—পেটুক হলেও বা কথা ছিল। শুধু খোসা আমি খাইনে, আমি চাই শাঁস!

ইত্যাদি বাজে কথা বকতে বকতে সে বেরিয়ে চলে গেল।

আবহাওয়াটা কেমন করে যেন হঠাৎ তিক্ত হয়ে উঠল। খেতে বসে তরকারিটা আলুনি লাগে, শুতে গিয়ে বিছানার মধ্যে পিঠে কাঁকর ফোটে, চলতে গেলে পা ব্যথা করে, কথা বলতে গেলে ভিতর থেকে আনন্দ জোগায় না। ঘর বাড়ী, গাছ পালা,—চারিদিকের এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুগুলি যেমন বিবর্ণ বিস্বাদ, তেমনি অবসন্ন ও আনন্দহীন।

ঘড়ির কাঁটা ধরে আগে কাজ চলত, আজকাল সময়ের অনুবর্ত্তন করতে গেলে একটু শ্রান্তি আসে। কাছারি যেতে সত্যেনের আজকাল বিলম্ব হয়ে যায়। স্নান এবং আহার, দুটো এক সাথে প্রায়ই হয়ে ওঠে না। কাছারি থেকে ঘরে ফেরতেও কি জানি কেন দেরী হয়। কোন দিন সে গঙ্গার ধারে ঘুরতে যায়, কোনোদিন বাগানে, কখনো কোনো মাঠে—কখনও বা কোথাও চুপ করেই হয়ত বসে থাকে।

আগে সত্যেন বাড়ীতে ঢুকলেই একটা সোরগোল উঠত, আজকাল সে একেবারে নিঃশব্দে আসে। পা টিপে টিপে এসে জুতোটি খুলে রেখে অন্য ঘরে গিয়ে ঢোকে। রাত্রির অন্ধকার দুইটি নরনারীর চোখে একটি উদাস বিষণ্ণতা আনে। সুলতা এই নিরানন্দের কোনো কৈফিয়ৎ চায় না, কোনো অর্থ আবিষ্কার করবার জন্য তার মন চঞ্চল হয় না—শুধু কেবল স্বামীর মনের বিষণ্ণতাটুকু স্মরণ করে তার বুক বেদনায় ভরে উঠে। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে স্বামীর পায়ের কাছে গিয়ে বসে।

ও কি হচ্ছে?—সত্যেন বলে—মিছামিছি পায়ে হাত বুলোচ্ছ কেন? সুস্থ মানুষের সেবা করতে গেলে লোকে যে সন্দেহ করে!

পায়ের ওপরেই হাত দুটি থেমে স্থির হয়ে থাকে। মৃদু আলোকে সত্যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলে—ঠিক সাপের মত তোমার হাতখানা আমার পায়ের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, চুড়িগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে, তোমারও তাই মনে হচ্ছে না সুলতা?

সুলতা ঘাড় নেড়ে জানালো তারও তাই মনে হচ্ছে!

সত্যেন উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যায় বটে কিন্তু আবার তখনই ঘুরে এসে হেসে বলে—এগুলো তোমার অভ্যাস, কি বল? এই গিয়ে ধর তোমার এই সেবা যত্নগুলো! স্বামীকে নিয়ে ঘর করা আগে তোমার অভ্যাস ছিল, এগুলো তোমার সমস্তই মুখস্থ—নয়?

সুলতা নিঃশব্দে সরল দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার চুপ করেই বসে রইল।

সত্যেন স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়াল। তারপর উত্তেজনায় উচ্চকণ্ঠে হঠাৎ পুনরায় হেসে বলল—তোমার মধ্যে না আছে রক্ত, না আছে আগুন, থাকলে এত বড় অপমান নিশ্চয়ই তোমার গায়ে বাজতো! এক রকমের জীব আছে তাদের গায়ে তীর বেঁধে না, ঠিক্‌রে পড়ে।

স্নলতা সজল চোখে শুধু বলল—তোমার শরীর ভাল নেই তাই এসব কথা বলচ।

শরীর ভাল নেই? বেশ আছি, চমৎকার আছি—এর চেয়ে সত্যি কথা, সহজ কথা আমি আর কোনদিন বলিনি!

স্নলতা বলল—আমি কিছুই মনে করি না!

তা জানি, তাই জন্যেই ত তোমায় এত ভারি মনে হচ্ছে! স্নলতা, আমি ভেবেছিলাম হাল্কা পাঁখায় তুমি আমার মনের আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াবে; এখন দেখছি তুমি পাথরের মত আমার স্রোতের মুখ চেপে বসেছ?

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সত্যেন চলে' গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে যারা বেঁচে থাকে, সত্যেন সেই দলের মানুষ। এক মুহূর্ত্তের একটি কথার আগে তার জীবনে সুখ ছিল, তৃপ্তি ছিল, সুন্দরী মমতাময়ী পত্নী ছিল, আনন্দ ও শান্তি ছিল—কিন্তু পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল তার কিছুই নেই! আতস বাজীর মত সব ছাই হয়ে গেছে। বেঁচে আছে বটে কিন্তু সে থাকা যেমন নিরবলম্ব তেমনি নিষ্ক্রিয়!

স্নলতার সমস্ত কথা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। অবারিত অশ্রু ছাড়া এখন তার আর কোন সম্বল নেই। চোখের জল ছাড়া ভালবাসার কি আর কোনো পরিচয় আছে?

সত্যেনের অভাবে তার সারাদিন যে কেমন করে কাটে তা শুধু সেই জানে! শ্রীহীন ঘরগুলিকে সে আবার নূতন উদ্যমে ও উৎসাহে সাজাতে থাকে। ছবিগুলির ধূলো ঝাড়ে, বই-কাগজগুলির বিন্যাস করে, বাক্স-আল্মারিগুলি ঝাড়ন্ দিয়ে মুছে মুছে তাদের চেহারা বদ্লায়, বিছানাগুলি রোদে দিয়ে আসে।

—বাঃ এত' বেশ! দমে' যাবার মেয়ে তুমি নও দেখছি! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—কি বল?

ঘোমটাটি মাথায় তুলে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে সুলতা বলে—এগুলো অনেক দিন দেখা হয়নি তাই জন্যে—

হ্যাঁ গো, বুঝতে পেরেছি ; তোমাকে বুঝতে পারব না, আমি কি এতই বোকা ? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুবিধে হবে কি ?

সুলতা কোনোদিন প্রশ্ন করে না। আজ বল্‌ল—কি সুবিধে ?

সত্যেন মুখ ফিরিয়ে চলে' গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠতে বেলা হয়ে যায়। কোমরে ব্যথা, মাথা টন্‌টন্‌ করে,—চোখের ঘুম ছাড়ে না। বিছানায় শুয়ে শুয়েই জান্‌লার বাইরে সত্যেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। শীতের সকালে রোদের আলোয় সমস্ত ঘর ভরে' গেছে, উঠে সারাদিনের কাজে নামবার কোনো ইচ্ছা তার দেখা যায় না ; খবরের কাগজটা একবার পড়বার চেষ্টা করে কিন্তু ভাল লাগে না। গরম চায়ের পেয়ালা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

তবু এক সময় উঠতে হয়। চারিদিকের আলোয়, লোক জনের কোলাহলের মধ্যে, ঠাণ্ডা বাতাসের যাতায়াতে যেন একটি ক্রূদ্ধ রুদ্ধ বিরক্তি ভেসে ভেসে বেড়ায়। দিনের মন্থরতার মধ্যে কেবলই যেন একই সুরে বেজে বেজে ওঠে—শ্রান্ত, অতৃপ্ত, অবসন্ন একটি সুর !

উঠে বাইরে এসে দেখল, সুলতা বসে বসে কাঁদছে। ঈষৎ কটু কণ্ঠে সত্যেন বল্‌ল—তোমার আবার কি হল ?

সুলতা কোনো উত্তর দিতে পারল না। সত্যেন বল্‌ল—কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ, এর মানে ত বুঝতে পাচ্ছি না ? তা ছাড়া তোমার চোখে জল আনবার মতন আমি ত কিছুই করিনি ? নাও ওঠো, যাও গিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কর।

সুলতা উঠে দাঁড়াল। চোখ মুছে বল্‌ল—তোমার নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে, আমাকে লুকিয়ে রয়েছ !

সত্যেন একটু হেসে বল্‌ল—সতী-সাবিত্রী স্ত্রী, সবই বুঝতে পারো বৈ কি! তা ধর মানুষের শরীর, রোগ-ভোগ কি দু' একবার হতে নেই? তবে কি জানো?—বলে দু' পা এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে' যাবার সময় আবার সে বল্‌ল—এ রোগ নীলরতন সরকারেরও নাগালের বাইরে মনে রেখো!

সুলতা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

এ কয়দিন কাছারি যাবার উৎসাহ তার আর ছিল না। কাজকর্ম্ম সমস্তই বন্ধ রয়েছে। সুলতার চিন্তার আর সীমা নেই। নীচের ঝি-চাকর পর্য্যন্ত সবাই যেন তটস্থ সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছে!

সুলতা আবার এল। সত্যেন তখন ছাতের রোদে মাথা হেঁট করে' বসে রয়েছে। বল্‌ল—দরজায় কড়া নেড়ে কে ডাকছে তোমাকে!

মুখ তুলে সত্যেন বল্‌ল—আমাকে? ওঃ বুঝতে পেরেছি, উপেন এসেছে। বলে' পাঠাও যে আমি বাড়ী নেই! ওর কাজকর্ম্ম আমি কিছুই করে' উঠতে পারিনি। আরে যাও বাপু, হাঁ করে চেয়ে থেকো না! এটুকু মিথ্যে কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না!

সুলতা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

দাঁড়িয়ে রইলে যে? থাক্ তবে আমিই চাকরকে দিয়ে বলে পাঠাই।

সুলতা মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল—উনি যে তোমার বন্ধু তুমি বলতে?—বলে' সে পা বাড়ালো।

সত্যেন হাসল। হেসে বল্‌ল—কি আশ্চর্য্য, বন্ধুর সঙ্গে একটুখানি মিথ্যাচারও করতে পারো না?—বলে' সে আস্তে আস্তে উঠে চলে' গেল।

চাকরের কাছে খবর পেয়ে বাবুটি চলেই যাচ্ছিল; অদূরে সুলতাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেই সে থম্‌কে দাঁড়াল। সত্যেনের স্ত্রী সুন্দরী এ কথা সে জানত, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য যে এতখানি তা তার জানা ছিল

না! ভেতরে দু পা এগিয়ে এসে বল্‌ল—দেখুন!—বলে সে দাঁড়াল।

সুলতা মুখ তুলতেই সে একটু সলজ্জ হেসে বল্‌ল—সত্যেনের সঙ্গে আমার বিশেষ কাজ ছিল। আমি তার মক্কেল বন্ধু দুইই। কাল যদি সে কাছারি না যায় ত আমিই আর একদিন আসবো—আজ এখন চল্‌লাম! দেখবেন, তাকে আমার খবরটি দিতে ভুলবেন না যেন!

বলে' একটু হেসে উপেন মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। বাইরে এসে একবার থম্‌কে দাঁড়াল, আবার একটুখানি হাসল, বাঁ-হাতের দামী পাঞ্জাবীর আস্তিনটা সরিয়ে একবার হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিল, গায়ের শালটা একবার ঠিক করল, তারপর নিজের মনেই বল্‌ল—অল্ রাইট!

বলে' হাতীর দাঁতের ছড়িটা ঘুড়িয়ে নারীজনোচিত ভঙ্গী করে শিস্ দিতে দিতে রাস্তার ধার ঘেসে সে চল্‌তে লাগ্‌ল।

শীতের বেলা শেষ হয়ে আসে। সত্যেনের তৃপ্তিহীন মন এক সময় অশান্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উঠে গায়ে একখানি কাপড় জড়িয়ে সে বেরিয়ে যায়। উদ্দেশ্যহীন হয়ে বহুক্ষণ ধরে' রাস্তায় অকারণে কত জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

সন্ধ্যার পর রাত্রি ঘনিয়ে ওঠে। অবিচ্ছিন্ন নিরানন্দের মধ্যে সে আবার ফিরে আসে। ঘরের জানালায় একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে, সুলতা বসে' বসে' তারই পায়ের মোজা সেলাই করছে। মুখ ফিরিয়ে সত্যেন আবার চলে' যায়।

কাজ শেষ করে' সুলতা খানিকক্ষণ বাদে উঠে দাঁড়ায়। খোলা জান্‌লা দিয়ে হু হু করে শীতের হাওয়া আসছে। বোধ হয় ত্রয়োদশী তিথি। আকাশে অনেক উঁচুতে চাঁদ উঠেছে। সুমুখের মাঠে কয়েকটা গাছ, দূরের বাড়ীগুলি, তাঁতিদের শিবমন্দির—সমস্ত চাঁদের আলোয়

ভরে' গেছে। অস্পষ্ট কুয়াসায় বহুদূরে স্থলতা তাকিয়ে থাকে। চোখে তার জল ভরে ওঠে। তার এই অসহায় জীবনের অর্থ কি—একথা কি তাকে কেউ বলবে না।

তার সমস্ত দেহ, মন, চিন্তা, হৃদয় একান্ত ভালবাসা দিয়ে তৈরী। আপনার প্রকৃতিতে বন-গোলাপের মত করুণ মধুর গন্ধই সে বিতরণ করতে পারে। তার মধ্যে মাধুর্য্য আছে কিন্তু দুরাশা নেই, গ্লানিহীন পরার্থপরতা আছে কিন্তু ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা নেই। আপনার রসভারে, সৌন্দর্য্যে, কারুণ্যে, দানের স্পৃহায়, গন্ধের বিস্তৃতিতে নিরুদ্দিষ্টের প্রতি তাকিয়ে সে টল্ মল্ করে! তার ভালবাসায় আঘাত নেই, দাবী নেই, ঈর্ষা নেই—সে যেমন অপরূপ, তেমনি সহজ! সে প্রেম শর-বিদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্ করতে পারে, আকণ্ঠ বেদনায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে জানে, অপমানের ঘায়ে আত্ম-গোপন করে কিন্তু উজ্জ্বল তীব্রতায় আত্মপ্রকাশ করে' আপনার স্পর্দ্ধা প্রমাণ করে না!

অনাথিনী অপার্থিব স্থলতা বহুদূরে চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিবিড় রাত্রির প্রতি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। জীবনের কোনো নিগূঢ় বেদনার সহিত তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—তার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টির প্রতি তাকালে শুধু এই কথাই বার বার মনে হয়।

রাত্রি অনেক হয়ে গিয়েছিল। স্থলতা ধীরে ধীরে সরে এসে একবার ঘরের চারিদিকে দেখল। আজ কাল দিনরাত প্রায় তার নিঃসঙ্গই কেটে যায়। ঘর পার হয়ে সে বাইরে এল! পাশের ঘরের দরজার কাছে এসে দেখল, খাটের একান্তে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সত্যেন বোধ করি ঘুমিয়ে রয়েছে। তারই একধারে এসে স্থলতা তার পায়ের কাছে বসল। তারপর মাথাটি আস্তে আস্তে নামিয়ে সত্যেনের দুই পায়ের মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ঘরের মধ্যে সবুজ রংয়ের মৃদু আলো ; বড় ঘড়ির কাঁটাটি টিক্ টিক্ করছে ;—মাথার সমস্ত চুলগুলি সত্যেনের পায়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, হেঁট হতে গিয়ে গায়ের কাপড় খুলে গেছে !

আবেগে সুলতার সর্ব্বাঙ্গ তখন থর থর করছে !

সত্যেন আস্তে আস্তে পা সরিয়ে নিল। পরে বল্‌ল—কী চেষ্টা ! একজনকে ভালবেসে জীবন কাটাবার জন্য মেয়েদের কি নিদারুণ চেষ্টা ! সুলতা, তুমি যে তোমার আগেকার স্বামীকেই ভালবাসো এজন্যে দোষ দেবো কাকে ? তিনি যে বেঁচে রইলেন না, সে ত আমারই নিয়তি !

সুলতা আরো কাছে স'রে গিয়ে বল্‌ল—আমি বলছিলাম যে,—অনেক কথা আমি ভাবছি, এ তোমার কি হল তা আমাকে বলতেই হবে ! তুমি ত এ রকম ছিলে না ?

সত্যেন একটু হাসল। হেসে কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে' গেল !

উঠে দরজার কাছে পর্য্যন্ত গিয়ে সুলতা বল্‌ল—ও ঘরেই যাচ্ছি,—আমাকে কিন্তু বলতেই হবে, নইলে কিছুতেই শুনবো না !—বলতে বলতে সে বেরিয়ে চলে' গেল। সত্যেন তার পায়ের দিকে একবার তাকাল, তারপর মুখে একটা আওয়াজ করে' গায়ের কাপড়টা তুলে নিয়ে আবার পাশ ফিরে চোখ বুজ্‌ল।

তিন

কিন্তু কোনো কথাই সুলতার আর শোনা হয়নি! কারণ সত্যেনকে প্রশ্ন করা এবং তার কাছে যথাযথ উত্তর পাওয়ার দিন চলে গিয়েছিল।

সমস্ত চেহারাটার দিকে তাকালে এখন বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। গায়ে-মুখে একপুরু ময়লা পড়েছে, দাড়িগোঁফ না কামিয়ে মুখখানা হয়ে উঠেছে কদাকার, মাথার চুল রুক্ষ,—চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল এবং কোটরগত, হাতের পায়ের আঙ্গুলে বড় বড় নখ,—একটি যেন ছন্নছাড়া রহস্যময় চরিত্রের মানুষ! নারীর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের একটি সরল স্বীকারোক্তি তাকে যেন সর্ব্বস্বান্ত করেছে।

প্রেম বোধ করি চিরদিনই ঈর্ষাময়! স্বার্থপরতাই হচ্ছে ভালবাসার রীতি!

সত্যেনের ভালবাসার মধ্যে কোথাও এতটুকু ত্যাগ ছিল না; সম্পূর্ণ দান করে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার ইচ্ছাকেই সে অন্তরে অন্তরে লালন করেছিল। সে ছিল নিরানব্বই জনের একজন!

তার জীবন যেন একটি মাত্র অনুভূতির অপেক্ষা রেখেই চলে। সুলতা তার আগেকার স্বামীকেও ভালবেসেছিল—এই সামান্য স্বাভাবিক সহজ কথাটি তার জীবনের সমস্ত আনন্দ, তৃপ্তি, শান্তিকে একটি মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট-বিধ্বস্থ করে দিয়ে গেল!

চিরকাল ধরে' একটি পূর্ব্ব-স্বামীগতপ্রাণা বিধবার প্রাণহীন দেহের ভার বয়ে' বেড়াবার শক্তি তার ছিল না।

সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, এবং সে রাত্রি যে কত তা আর সত্যেনের হুঁস ছিল না। শ্রান্তি ক্লান্তি আর নেই কারণ ওসব আর তাকে স্পর্শ করে না! ঘুরতে ঘুরতে নিশুতি রাতে সে ভূতের মত বাড়ীর দরজায় এসে

দাঁড়াল! দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে তার ইচ্ছা হল না, সেইখানেই বসে' পড়ে সে দেয়ালে মাথা কাৎ করে রইল।

অন্ধকার রাত্রি তখন চারিদিকে সাঁ সাঁ করছে!

প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙতেই সে অবাক হয়ে গেল। দেখল, কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে পাশে বসে' সুলতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। লজ্জায় ধিক্কারে তাড়াতাড়ি রাস্তার ধার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সুলতার হাত ধরে' সে ভিতরে এল। বল্‌ল—ছি ছি, যেমন আমি তেমন তুমি। রাস্তার লোকে কি মনে করে বল দেখি? সুলতা, তোমাকে দেখে মনে হয় জীবনে তোমারও বুঝি তৃপ্তি নেই!

সত্যেনের চোখ দুটো তখন লাল হয়ে রয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, চোখের ঘুম ছাড়েনি, দুর্ব্বলতায় বুকের ভেতরটা ধক্ ধক্ করছে!

অদূরে চোখে কাপড় দিয়ে সুলতা দাঁড়িয়ে ছিল। সত্যেন বল্‌ল—চান করে খেয়ে দেয়ে আর একটু ঘুমোবো। চল ত!

ঈষৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুলতা চুপ করে' রইল!

অবিরাম স্রোতধারার মত দিনগুলি আপনার আনন্দে আগেকার মত আর বয়ে চলে না। ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের করুণ ছায়া এই নিরানন্দ গৃহখানির ওপর নেমে এল। উপার্জ্জনের স্পৃহা সত্যেনের আর ছিল না, জনসমাজের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে' সোরগোল করবার ইচ্ছাও তার আর নেই। চিরদিনের মত আত্মলোপ করবার চেষ্টাকেই সে বরণ করে নিল।

কিন্তু প্রতিটি দিন এবার থেকে কাট্‌বে কেমন করে'?

ঝি-চাকর তাদের সাময়িক প্রাপ্য সম্বন্ধে হতাশ হয়ে একে একে কটূক্তি করে' চলে' গেল। প্রতিদিনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা এই ক্ষুদ্র গৃহস্থটির মধ্যে আর দেখা যায় না। যারা ছিল নীচে, গোপনে—

তাদের দাবিই আজ মাথায় চড়ে আপনাদের স্পর্দ্ধা প্রকাশ করতে লাগল। মুদী এল খাতা নিয়ে, ধোপা এল তাগাদায়, দুধওলা এসে দরজার কড়া নাড়ল, কয়লাওলা হাঁক দিল, কাপড়ওলা চীৎকার করে' উঠল। যাদের ওপর দাঁড়িয়ে গৃহস্থরা আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের দোল খায়—সেই ভিতগুলি প্রচণ্ড দাবিতে নড়াচড়া করতে লাগল। নীচের পাঁক ঘুলিয়ে উঠে স্বচ্ছ সরোবরকে ক্লেদাক্ত করে' দিল।

আসবাব পত্র গেল, মুল্যবান পরিচ্ছদ গেল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি গেল। অর্থের প্রাচুর্য্য হেতু যে লোকনিন্দা এতদিন আত্মগোপন করে' ছিল, দারিদ্র্যের সুবিধা পেয়ে তারা মাথা চাড়া দিয়ে কানাকানি করে' বল্‌ল—এমনিই হয়! বিধবাকে গ্রহণ করা,—এত বড় অন্যায় সইবে কেন?

নিন্দার তীক্ষ্ণ হাসি, বিদ্রূপের জঘন্য ভঙ্গী, বিরক্তির তীব্র উক্তি, ঘৃণার নির্ম্মম ইঙ্গিত—একে একে ছিট্‌কে এসে সুলতাকে রুদ্ধনিশ্বাস করে' তুল্‌ল! দয়াহীন সহানুভূতিহীন লোকনিন্দা তার হিংস্র মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে সুলতার বুকের ওপর বসে' ধারালো নখরে তার সর্ব্বাঙ্গ আঁচ্‌ড়াতে লাগল।

কিন্তু এদের বিরুদ্ধে সে কি করতে পারে? কতটুকু শক্তি তার? যুদ্ধ করে' নিজেকে বাঁচাবার মত মেরুদণ্ড ত তার আর নেই! চিরজীবন ধরে' আঘাত সইতেই সে জানে, মাথা উঁচু করে' সে ত প্রতিবাদ করতে শেখেনি।

দুটি সজল বিশাল ও গভীর দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে' সুলতা শুধু কি যেন তার ব্যর্থ জীবনের কথা বলবার চেষ্টা করল—কিন্তু কা'কে সে জানাবে? হেমন্তের দিবাবসানের শীতার্ত্ত ধূসর আকাশ, তা ছাড়া আর কিছু তার দৃষ্টিতে এল না! ওই আকাশের কোন্ কোণে তার সান্ত্বনা—কোথা তার ঘর, কোথা স্থান তার?

নীচে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, সুলতা মুখ বাড়িয়ে একবার দেখল।

সত্যেন বুঝি বাড়ীতে নেই ?

সুলতা ধীরে ধীরে নেমে এল। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—তিনি নেই এখন, বোধহয় এই কাছাকাছি কোথাও—

উপেন কয়েক্‌ পা ভেতরের দিকে সরে' এল। বল্‌ল—নেই ? ও, আচ্ছা কোথায় গেল বলুন ত ?

আমাকে কিছুই বলে যান্‌নি।

বলে যায়নি ?—উপেন বল্‌ল—ভারি অন্যায় ত ! কোথায় যাই না যাই স্ত্রীকে অন্তত বলে যাওয়া উচিত—নয় কি, আপনিই বলুন না ?

সুলতা চুপ করে' রইল !

আচ্ছা—বলে উপেন আরো দু' পা সরে এসে বল্‌ল—সে আজ কাল এত লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কেন জানেন ? আমার যেন মনে হচ্ছে—তা সে যাই হোক, তার যা ইচ্ছে সে তাই করবে ; আপনি কিম্বা আমি ত আর তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে পারব না ! কিন্তু তবুও বলি, তার গতি-বিধির ওপর একটু নজর রাখলে ভালো হয় !

সুলতা মুখ তুলে তার প্রতি একবার তাকালো।

উপেন তার চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট করে বল্‌ল—মনে হচ্ছে আপনি কিছু বুঝতে পারেননি ! যাক্‌ গে ও-কথা, আমার কিন্তু অনেক কাজ ছিল সত্যেনের সঙ্গে !

এলে তাঁকে বল্‌ব !

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবেন।—একটু হেসে সুগন্ধীযুক্ত সিল্কের রুমালখানা বা'র করে একবার মুখখানা মুছে উপেন বল্‌ল—বেশ আপনি ! স্বামীর কোনো খবর রাখেন না ; এরকম করলে কি চলে ?

মাথা হেঁট করে' সুলতা দাঁড়িয়ে রইল। সত্যই ত, এ যে তার ভয়ানক অপরাধ!

উপেন পুনরায় বল্‌ল—কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, চারিদিক এমন শুকিয়ে চড় চড় করছে কেন বলুন ত?

কি একটি উত্তর দেবার চেষ্টা করে' সুলতা আবার নীরব হয়ে গেল।

এইটিই ত আপনাদের বাইরের ঘর, একটু বসি এখানে তার অপেক্ষায়!

বাইরের ঘরে ঢুকে একটা চৌকির ওপর সে চেপে বসে বল্‌ল—সত্যেন হচ্ছে আমার পাঁজরের একখানা হাড়; বন্ধু বলতে সে ছাড়া আমার আর কেউ নেই! আপনি কি আর সে সব বুঝবেন? গৃহ-প্রবেশের দিনে আপনাদের সমস্ত কাজই আমাকে করতে হয়েছিল, মনে আছে কি আপনার?

ঘাড় নেড়ে সুলতা জানালো, তার মনে আছে!

উপেন বল্‌ল—আপনি ওরকম মিইয়ে থাকলে কোনো কথাই মুখে আসে না! একটু হাত-পা নেড়ে চঞ্চল হয়ে উঠুন?

উত্তরে সুলতা মাথার ঘোমটা একটুখানি টেনে নিল।

এদিকে ওদিকে কোথাও জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই—নিকটে-দূরে সামান্য একটু শব্দও শোনা যাচ্ছিল না! দূরে কোথায় এইমাত্র কাঁসারীর ঢং ঢং আওয়াজ মিলিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ভারি মুস্কিলে পড়লাম! এবার আপনার সঙ্গে আর কি কথা কওয়া যায় বলুন দেখি? কিন্তু যাই বলুন, সে দিন আপনাকে যে রকমটি দেখেছিলাম আজ তার অর্দ্ধেক চেহারাও আপনার নেই। ভারি রোগা হয়ে গেছেন! সত্যেন কি আজকাল আপনাকে তেমন যত্ন টত্ন করে না?

সুলতা একটু বিপন্ন, একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

—সত্যি, আপনারা আমাদের সমস্ত জীবন-ধারণের মূলে রয়েছেন। আপনাদের অবজ্ঞা করা, আপনাদের অযত্ন করা,—এ আমাদের সইবে না!—বলতে বলতে উপেন উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল—মেয়েদের ওপর আমরা কতদিক দিয়ে কত রকমে অন্যায় করি বলুন ত? তাদের মাথা তুলতে দিই না, তাদের মনের কথা বলতে দিই না, তাদের আঘাত করে' আনন্দ পাই, তাদের বেদনাকে ব্যঙ্গ করি, পায়ে পায়ে তাদের ভুল বুঝে শাস্তি দিই, উদাসীন হয়ে তাদের ওপর অবিচার করি, নিষ্ঠুরের মতন তাদের দু'পায়ে মাড়িয়ে যাই! যাই বলুন, এসব সত্যেনের ভারি অন্যায়! খাওয়া দাওয়া হয়েছে আপনার?

মুখ তুলে তাকাতেই বড় বড় দু' ফোঁটা চক্‌চকে চোখের জল সুলতার গালের ওপর গড়িয়ে এল।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে উপেন চুপ করে রইল, তারপর পরম আগ্রহে নিতান্ত কাছে সে সরে এল। বল্‌ল—জল! চোখে আপনার জল? কি হয়েছে বলুন ত? এত বড় দুঃখ আপনার মধ্যে, এতক্ষণ আমার কাছে চেপে ছিলেন? আপনাকে সান্ত্বনা দেবো, এত বড় ভাগ্য আমার নেই, চুপ করেই হয়ত আমাকে বসে থাকতে হবে, কিন্তু—

এতখানি সহানুভূতি, এতখানি আন্তরিকতা সুলতা অনেকদিন পায়নি। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বল্‌ল—আপনার কাছে সব কথাই বলতে পারি। আমি কারো কাছে কিছু লুকোতে পারি না!

বলবেন বৈ কি, নিশ্চয় বলবেন। দেখুন, ভালো লোক আমি হয়তো নাও হতে পারি কিন্তু—কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, মেয়েদের চোখের জল আমাকে চিরকাল চঞ্চল করে তোলে! আমার কোনো রকম সত্যের ধারণা নেই, কোনো ধর্ম্ম বোধ নেই, একটা কোনো বিশেষ মতামত বা বিশ্বাস নিয়ে আমি চলিনে, কোনো প্রতিষ্ঠাও নেই আমার—

নিতান্ত সাধারণ বাঙালী র ছেলের মতই ঘুরি ফিরি, এখানে ওখানে যাই, হুজুগ নিয়ে ঘর করি, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিই, দুরাশাগুলো নিয়ে মনে মনে মালা গাঁথি, জীবনটাকে প্রতিদিন বাজে কাজে, বাজে কথায় একটু একটু করে খইয়ে দিই—

সুলতা তার নিঃসঙ্কোচ স্বীকারোক্তির প্রতি তাকিয়ে ছিল।

উপেন বলতে লাগ্‌ল—হ্যাঁ বুঝেছেন, ঠিক এমনি করেই আমার দিন চলে যায়। কোনো কাজ নেই, অকাজের বোঝা টেনে টেনে ঘুরে বেড়াই। বড় জিনিসের আস্বাদ কোনোদিন কিছু পাইনে, মনের প্রসার কাকে বলে জানিনে,—মানুষ কেমন করে কোন্ পথে বড় হয়ে ওঠে তা আমার কাছে স্বপ্নের মত! ভালবাসা নেই, মমতা নেই—মেয়েদের সংস্পর্শে কোনোদিন আসিনি বলে নিজের সঙ্গেও ভাল করে পরিচয় হল না—

হঠাৎ একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে উপেনের চমক ভাঙ্‌লো। সুলতার মুখের দিকে এক বার তাকিয়ে সে বল্‌ল—তাইত, হ্যাঁ—কি যেন বলছিলাম আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন! মুছুন, চোখের জল মুছে ফেলুন, ও আমি সইতে পারিনে!—আচ্ছা বেলা চারটা বাজে, এখনও আপনার খাওয়া দাওয়া,—বলুন ত দেখি আমাদের কি হল?

এই আগ্রহাতিশয্যে, মমতায়, করুণায়, পরার্থপরতায় সুলতা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। অন্তরের কোন বাধাই আর তার রইল না। ধীরে ধীরে অকপটে মৃদুকণ্ঠে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে এতদিনের সমস্ত ঘটনাগুলি বলে যেতে লাগল। কান্নায় তার গলা বুজে আসছিল, বেদনার আবেগ তাকে দিশেহারা করে দিচ্ছিল, চোখের জলে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল—তবুও তাকে সমস্তই বলতে হলো। তার মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না, অনাত্মীয়তা

ছিল না,—সরল সহজ ভাবে নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথাগুলি বল্‌তে লাগল।

চমক যখন ভাঙ্‌লো, তখন সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। উঠে দাঁড়াতেই সুলতা বল্‌ল—শুনলেন ?

উপেন তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বল্‌ল—অন্য সময় আবার আমি আসবো !

দরজা পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে সে নামল, এক মুহূর্ত্ত একবার থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর আবার ভিতরে এল। দরজার কাছে সুলতা দাঁড়িয়েই ছিল, পকেট থেকে একমুঠো টাকা ও নোট বা'র করে' কোনোরকমে তার হাতে পুরে দিয়ে উপেন বল্‌ল—এখন এতেই চালিয়ে নিন্‌, বাড়ী গিয়ে মানুর মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ; তার পর সত্যেনের সঙ্গে দেখা হলে—

বলতে বলতে সে বেরিয়ে আসতেই সদর দরজার কাছে একেবারে সত্যেনের সঙ্গে মুখোমুখি।

মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে সত্যেন বলল—এ কি হে, চোখে তোমার জল কেন ? বুড়ো বয়সে এ আবার কি ?

আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে উপেন বলে' উঠ্‌ল—তুমি মানুষ নয়, তোমার কোনো বিবেচনা নেই ; মায়া দয়া নেই, তুমি মেয়েদের সম্মান দিতে জানো না ; তুমি নিষ্ঠুর, তুমি কাপুরুষ, তুমি—

তীরবেগে উপেন বেরিয়ে চলে' গেল।

তার পথের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে সত্যেন আস্তে আস্তে ভেতরে এল, হঠাৎ সুমুখে দরজার কাছে সুলতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই সর্পাহতের মত এক-পা সে পিছিয়ে গেল, বল্‌ল—আঁ্যা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ? ও—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে,

আর উপেন এতক্ষণ—এই যে বৈঠকখানার দরজাও খোলা। তাই ত বলি, উপেনের এ নাটুকেপণার মানে কি! কান্নাকাটি ত হলই দেখতে পাচ্ছি, তা ছাড়া—বারে, হাতে যে টাকাও দেখছি। বকশিস দিল নাকি? ক' টাকা?

টাকাগুলি স্থলতার হাত থেকে ছড় ছড় করে ছড়িয়ে পড়ল।

—হুঁ: তা অনেকগুলি বটে! আর দেখতেও ত' তুমি মন্দ নও! বাজিয়ে-নিয়েছিলে ত? চল্‌বে?

স্থলতা আস্তে আস্তে চলে' যাবার চেষ্টা করল।

মাঝখানে শুধু কয়েকটি মুহূর্ত্ত—

যে-মুহূর্ত্তে ছোট্ট পৃথিবীর ওপর প্রলয় ছুটে আসে; এক হাতে সে আনে ঝঞ্ঝা, অন্য হাতে প্লাবনের মহামারী; যে-মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরি অগ্নি-উদ্গার করে' জনপদকে বিধ্বস্ত করে' দিয়ে যায়, বাসুকীর দুর্ব্বল ফণা কেঁপে উঠে ভূমিকম্প আনে—

যে-মুহূর্ত্তে শয়তান ভগবানের সিংহাসন দখল করে' বসে!

সমস্ত সৃষ্টির প্রতি মানুষের মন যে-মুহূর্ত্তে বিষাক্ত হয়ে ওঠে!

সত্যেন এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়াল। বিপন্নের মত স্থলতা তখন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

সত্যেনের সেই কদাকার বিকৃতি মুখখানা মৃদু আলোয় সহজে আর চেনাই যায় না। মুখের ভেতর থেকে তার কেমন একটা অস্বাভাবিক হাসি হঠাৎ ফেটে উঠ্‌ল। সমস্ত দাঁতগুলো মুখের ভেতর থেকে একটা ভয়ানক চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এল।

—কেমন লাগ্‌ল গো উপেনকে? একেবারে অবাক হয়ে গেলে যে? কেনই বা ভালো লাগবে না বল! বড় লোকের ছেলে, দেখতে শুনতে ভালো, বড় বড় কথা বলে…চমৎকার, নয়? হা হা হা, তোমার সঙ্গে আমার দেখা শোনাটা ঠিক ছোট গল্পের মত! ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থাক্ আর নাই থাক্, চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার!

সুলতা কি উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। সত্যেন কাছে সরে এল, বল্‌ল—সরল উদার মেয়ে! উদারতাটা বোধ হয় তোমার জন্মগত নয়? আচ্ছা ভেতরটা যে তোমার অন্যায়েতে ভরা, বাইরে তার কোনো চিহ্নই ত নেই?—ভাবচো বোধ হয় যে, চোখে কেমন করে' জল এনে আমায় ভুলোবে?

সুলতা বল্‌ল—কি হলো তোমার?

ছুটে গিয়ে সত্যেন একবার পায়চারি করে এল। তারপর বল্‌ল—রূপ? তা তুমি দেখতে নেহাত মন্দ নয়,—এই ত মাথার চুল এলিয়ে পড়েছে,—মাইরি, যেন নববর্ষার মেঘ! ধরবো, চুলের মুঠি একবার পাকিয়ে ধরবো?

আর একবার সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে এল। বল্‌ল—কী তুমি! রাগ নেই, হিংসে নেই, অভিমান নেই, অহঙ্কার নেই,—কি আছে তোমার? তুমি নীচ হলে না কেন, কেন স্বার্থপর হলে না, তুমি বাঙ্গালী মেয়ের দোষগুলো সঙ্গে আনলে না কেন,—তা হলে যে বাঁচতাম!—সত্যেন তার হাত চেপে ধরল।

কি? কি বল্‌চ তুমি?

কিছু না! খেয়ালের খেলা শেষ হয়ে গেছে, খেল্‌নাকে এবার ভাঙতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলত' কি দুঃখু পেলাম তোমার জন্যে?

একটি বারও ভাবলে না আমার কথা? এতটুকু দয়া মায়া এল না? সত্যি বলছি, বাঙলা দেশের একটি মেয়েরও বোধ হয় সত্যিকারের সতীত্ব নেই!

আবরণ উচ্ছ্বাসে কাঁপতে কাঁপতে সত্যেন আবার বল্‌ল—কি না করলাম তোমার জন্যে? আমার কি দুঃখু পাবার কথা ছিল? ব্যথা পাবার? সমস্ত জীবন দিয়ে যাকে ভালবাসতে গেলাম তাকে কি এমন মর্ম্মান্তিক অপমান করবার কথা ছিল?

চীৎকার করে' সারা ঘরময় সে আর একবার পায়চারি করে' বেড়ালো। হঠাৎ নজর পড়ল আল্‌নার পাশে একটা বেতের ছড়ির দিকে—তারই সখের ছড়ি—বিদ্যুদ্গতিতে সেটা হাতে করে' এনে বল্‌ল—কত ভাল বাসতাম একবার জানিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে!

বলতে বলতে সপাৎ সপাৎ করে' নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত সে সুলতার সর্ব্বাঙ্গে বেত মারতে লাগল। কাপুরুষের কোনো সংযমই আর রইল না!

মুখে, বুকে, হাতে, পিঠে, কোমরে, পায়ে—সর্ব্বাঙ্গে অবিশ্রান্ত বেতের প্রহারে ছট্‌ফট্ করতে করতে সুলতা মাটীতে লুটিয়ে পড়ল।

—আর না, আর ঢেকো না. তোমার সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়ুক! তোমাকে লোকে জানুক, বুঝুক, তোমার লজ্জাকে সবার চোখে আর লুকিয়ে রেখো না! স্বৈরিণি, তুমি আমার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছ! তুমি আমাকে উচ্ছন্ন দিলে, আমায় তুমি নষ্ট করলে!—বলতে বলতে গলা ধরে আসতেই সত্যেন ছড়িটা ফেলে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেল।

খানিকক্ষণ অসহ্য একটি স্তব্ধতা! মাঝে মাঝে সুলতার একটি অস্ফুট জর্জ্জর আর্ত্তকণ্ঠ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

বাইরের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।—

—বলি এত অন্ধকার মা, একটা আলো না হয় ধর, তা কারো কাণেও যায় না। বুড়ো মানুষ, এত রাতে কি আর নড়্ বলতেই ফাই-ফরমাস খাট্‌তে পারি বাছা? ওমা, এরা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি গো? তবে আর কেন বাছা আমায় কষ্ট দিলে? খেয়ে দেয়ে সোয়ামী নিয়ে ঘরে ঢুকলে আর এদিকে আমি,—ওমা না, এই যে আলো জ্বলছে! আমি ঝি গো বাছা উপেনবাবুর!

দরজার কাছে এসে উঁকি মেরেই ঝি একেবারে আঁৎকে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে গলা উঁচু করে' বল্‌ল—ওমা, কোথায় এসে পড়লাম গো! অ বৌমা? একি সর্ব্বনেশে কাণ্ড গা?

দৌড়ে ভেতরে ঢুকে আর কোথাও কিছু না পেয়ে নিজের গায়ের চাদরখানা ঝুপ্ করে সে সুলতার গায়ের ওপর ফেলে দিল।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বল্‌ছিল। সেই আলোয় স্তম্ভিত হয়ে মানুর মা দেখল, সুলতার সুন্দর মুখখানির ওপর রক্তের একটি রেখা জমে উঠেছে; হাতের ওপর লম্বা লম্বা কয়েকটা কালশিরার দাগ, গলার নীচে থেকে বুকের ওপর একটি স্তনের চূড়া পর্য্যন্ত আরো একটি রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছে! অনাবৃত তার সেই রক্তাক্ত দেহে কোনো সাড়ই ছিল না। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল, তার ওপরেই একটুখানি করুণ হাসি হেসে সুলতা বল্‌ল—রাগী লোক কিনা, সব সময় সাম্‌লাতে পারেন না। এ জন্যে নিজেই কি পরে কম দুঃখু করবেন?

ঝির মুখে এবার কথা ফুট্‌ল—দোষ ঢেকো না মা, সোয়ামীর দোষ অমন করে' ঢেকো না। সে কাল আর নেই! মাগ্ ত' আর সম্পত্তি নয় যে যা খুসী তাই কোরবো! চড় নয়, চাপড় নয়—এমনি করে খুন করতে হয় বাছা? তুমি মা আর দোষ ঢেকো না, লোকে টের পেলে

এখুনি থানা-পুলিশ হয়! আমাদের ঘরে ঝগড়াঝাঁটি হলে চড়-চাপড়টা চলে—এ যে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! সন্তানের মা, এসব কি আমরা সইতে পারি?

সুলতা আবার একটুখানি ম্লান হাসি হাসল। বল্ল—সইতে হয় মানুর মা, সমস্তই সইতে হয়—উনি বলেন, যা কিছু আমরা পাই সবই ভগবানের দান! দুঃখু সইতে কা'র না ভাল লাগে মানুর মা? মুখ বুজে পড়ে' পড়ে' মার খাবার সুখ সবাই কি পায়?

জল এনে মানুর মা তার ক্ষতস্থানগুলি ধুইয়ে দিল, পরে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস করতে করতে বল্ল—রাগী নয় মা, তোমার সোয়ামী বদ্‌রাগী! রাগীর অন্য চেহারা! ছিঃ। গেলেন কোথায় তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা হয় না? যত ভাবছি, আমি আর সইতে পাচ্ছিনে! আমরা গরীব লোক, নির্দ্দোষীর শাস্তি আমাদের বুকে বড় লাগে মা! যাই, উপেনবাবুকেই না-হয় ডেকে আনি!

মানুর মা'র কোলের মধ্যে মাথা রেখে সুলতা বল্ল—সেকি ভাল হবে? উপেনবাবু জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, পরোপকারী, তাঁর মনে ঘা দেওয়া কি ভাল হবে?—মুখ লুকিয়ে বার বার মাথা নেড়ে সে বল্ল—আমাকে ছেড়ে কোথাও আজ তোমার যাওয়া হবে না মানুর মা!

বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার শীতের রাত্রি তখন থম্ থম্ করছে!

চার

দুটি দিন পার হয়ে গেছে।

এত বড় আঘাত সুলতা সইলোও যেমন অতি সহজে, ভুলতেও তার তেমনি দেরি লাগল না! শিশু যেমন মার খেয়ে একবার কাঁদে, আবার হাসে, আবার খেলাধুলায় মন দেয়, সুলতাও তেমনি আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী আবার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রতি মুখ ফিরিয়ে তাকালো! বোধ করি কিছু তার মনেই রইল না।

মানুর মা দিনরাত্রিই প্রায় থাকে। একা এই নির্বোধ সরল স্বার্থ-বুদ্ধিহীন মেয়েটীকে ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে ফেলে সে চলে যেতে পারেনি। সন্তানের মা সে! বাজার করে আনে, বাসন মাজে, রান্না-বান্না করে, —আবার সময় মত কাছে এসেও বসে।

—তা বাছা, এ আর আমার চোখে সইবে না কেন বল? স্বামী দুটো ধম্‌কালো, দু'ঘা রাগের মাথায় বসিয়ে দিল—এ এমন হয়েই থাকে! তবে কি জানো মা, খুন-খারাপি আমরা সইতে পারি নে। আমাদের গায়ের রক্ত চন্ চন্ করে' ওঠে।

মানুর মাকে ভোলাবার জন্য সুলতা একটু আধটু পূর্ব্বস্মৃতি-কথা বলবার চেষ্টা করে।

—বুঝলে মানুর মা? ওঁর যে কি রকম সংসার কর্‌বার সখ তা তোমায় বলতে পারি নে! কতদিনের কত রাত যে এই নিয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা হয়েছে, তা মনে করতে গেলে হাসি পায়! মানুর মা, অমন মানুষ তুমি আর কোথায় দেখতে পাবে না!

—তা বাছা, তোমার সোয়ামীর আমি নিন্দে ত করিনে, কাজের নিন্দেই কচ্ছিলাম! তা ধর তুমি যদি সব সইতে পারো মা, তাহ'লে আমার গায়েই বা জ্বালা ধরে কেন বল!

—না তাই বলছি, এই মানুষটিকে আমি চমৎকার চিনি,— মনে মনে ওঁর কথা ভেবে আমি এক এক সময়ে একেবারে অবাক হয়ে থাকি! কত অন্যায় আমার সহ্য করেছেন বল দেখি? আমি কি দুনিয়ার কিছু বুঝতাম, না জানতাম, উনিই ত ধরে' ধরে'—

স্বামীর প্রতি এই অকপট এবং সরল উচ্ছ্বাস মানুর মা ঠিক ধরতে পারে না। উঠে যাবার সময় বলে—ভাল হলেই ভালো মা,—তোমার জিনিস তোমারই থাক্ এইত' সবাই চায়! তাব'লে খুনে স্বামীর গুণ গাওয়াটা কি সবার সয়?

সুলতা চুপ করে' থাকে। কেমন করে' সে বোঝাবে সত্যেন তার কতখানি! তবুও মানুর মা'র পরার্থপরতার কাছে মাথা তার নত হয়ে আসে। এই অনাত্মীয় পরিচারিকার প্রতি সমস্ত স্নেহমমতা তার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।

—অ বৌমা, শোনো বাছা, একবার নীচে যাও, সদর দরজায় গিয়ে একবার দাঁড়াও!

সুলতা বল্‌ল—ওঁকে বুঝি কেউ ডাকতে এল কাজের জন্যে?

—ওঁকে নয়, তোমাকে। উপেনবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

উপেনবাবু? যাই!

টক্ টক্ করে সে নীচে নেমে এল। দরজার কাছে আসতেই অদূরে দাঁড়িয়ে উপেন বল্‌ল—দুদিন আসিনি ইচ্ছে করেই, কেন এমন হল বলুন ত?

চন্দ্রের গায়ে কলঙ্কের মত সুলতার হাতে মুখে তখনও দড়া দড়া দাগ ফুটে রয়েছে। ধীরে ধীরে সুলতা বল্‌ল—আপনি ত সেই চলে গেলেন …টাকা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে দেখে,—আমাকে উনি বিশ্বাস করলেন না!

কোথায় সে?

এখন নেই। ভোর বেলা উঠে বেরিয়ে যান, আবার আসেন অনেক রাতে! তিনি কারো মুখ দেখেন না।

ও। রাতেও দেখা হয় না আপনার সঙ্গে?

উহুঁ; না—তিনি থাকেন তেতলার ঘরটায়। ডাকতে গেলে সাড়া দেন্ না, খান্ না কিছুই। আমি তাঁকে দেখতেই পাই না।

এত বড় অপমান আপনি সহ্য করে যাবেন? স্ত্রী হওয়াটা কি এত বড় অন্যায়?

সুলতা কোনো উত্তর দিতে পারল না! কিয়ৎক্ষণ পরে বল্‌ল—আসুন, ভেতরে এসে বসুন!

না, আর ভেতরে নয়—উপেন বল্‌ল—আমরা এক চাবুকের ঘোড়া, সোজা কথাটা আমরা সোজা করেই বুঝি। মেয়েদের ওপর যেখানে এত বড় অপমান, এত বড় কাপুরুষতা অবাধে চলতে পারে, অন্যায়ের যেখানে কোনো প্রতীকারই নেই—আমি সেখানে স্থান করতে পারিনে। আমার অনেক দোষ আছে বুঝলেন, কিন্তু অন্দরে বীরত্ব প্রকাশ করবার ইত্‌রোমো আমার নেই!

কষ্টে রাগে আক্ষেপে উপেনের গলা ভারি হয়ে এল।

সুলতা মাথা হেঁট করে' রইল। স্বামীর কৃতকর্ম্মের জন্য একমাত্র সেই যেন দায়ী। সুতরাং উপেনের তিরস্কারকে সে শ্রদ্ধা না করে' পারল না।

উপেন বল্‌ল—খবরটা শুনে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! একি হতে পারে? সত্যেন এই করল? মেয়েদের অতিরিক্ত সম্মান করার জন্য বরাবর সত্যেনকে আমরা ঠাট্টাই করে' এসেছি। স্ত্রীলোকের নামে তার মাথা নুইয়ে পড়ত, মেয়েদের ওপর সমাজের নানা অত্যাচারের জন্য কতদিন সে কত বক্তৃতা দিয়েছে, কত লোকের সঙ্গে কত লড়াই করেছে, কত জায়গায় বদ্‌নাম কুড়িয়েছে,—তার এই কাজ? হায় রে, আলোর নীচেই ঘোর অন্ধকার!

সুলতা বল্‌ল—ভাল হয়ে উঠ্‌লে ওঁকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারি।

বুঝিয়ে বলবেন? আপনি? এ অপমান ভুলে গিয়ে আবার আপনি তাকে,—অবশ্য আমি ত বাইরের লোক, আপনাদের ভেতরের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করার দরকার কি আমার! বেশ, এখনকার মত আমি চললাম। যদি কিছু অন্যায় বলে' গিয়ে থাকি তাহলে মার্জ্জনা করবেন!

মুখ ফিরিয়ে রাস্তায় নেমে উপেন তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সুলতা ভেতরে এল। মানুর মা তখনি বঁটি পেতে কুট্‌নো কুট্‌তে বসেছে। সুলতাকে ম্লানমুখে আসতে দেখেই সে বলে' উঠ্‌ল—সবাই ত আর পাথরে গড়া নয় মা, এ-কথা শুনলে সবাই তেতে উঠে। বাবু বুঝি রাগ করে' গেল বন্ধুর ওপর, হ্যাঁ বৌমা?

বৌমার গলার মধ্যে অনেক কথা এক সঙ্গে বলার জন্য ঠেলাঠেলি করে উঠল। দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে নড়ে চড়ে একটুখানি চঞ্চল হয়ে ঈষৎ অশান্ত কণ্ঠে বলল—বুঝলে মানুর মা, সত্যি বলছি তোমায়, উপেনবাবুর এক একটি কথার অনেক দাম। আমি প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলাম—

মানুর মা হাত থামিয়ে তার মুখের দিকে তাকালো!

সুলতা আত্মবিস্মৃত হয়ে বলতে লাগ্‌ল—সব কথা ভেবে ভেবে এমন গুছিয়ে বলতে পারেন উপেনবাবু যে, আমি অবাক হয়ে যাই। অন্যায় বলবার লোক তিনি নন্‌। আমার জন্যেই যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে তা তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরে চলে' গেলেন। তা' বলে' তিনি কি আর রাগ করেছেন? মোটেই না, এমন একটু আধটু কড়া কথা অমন সবাইকেই বলতে হয়? মানুর মা, মুখ বুজে চুপ করে' মানিয়ে চলতে গেলে ভদ্রতা থাকে কিন্তু সংসার চলে না। বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, বিবেচনায় উপেনবাবু সবার চেয়ে—

থাক্ বাছা; চুপ কর মা—নিন্দে হবে! পর-মানুষের কথা অত করে কি আর বলতে আছে? উপেনবাবু বাইরের লোক!

ও।—সুলতা হঠাৎ চুপ করে' এক দিকে তাকিয়ে রইল।

শীতের শেষে বসন্তকাল। বাতাস থেকে ঠাণ্ডার আমেজটুকু এখনও মিলোয় নি। নিমগাছের আগায় লাল কচি পাতা মুখচোরা এলোমেলো উড়ো হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে।

আকাশ মেঘ্‌লা; অসময়ে বৃষ্টি নামবার একটি আয়োজন দুদিন থেকে চলেছে। আকাশটা ভ্রূকুটি করে' অভিমানে আহত হয়ে রয়েছে; প্রিয়বিরহের একটি সুস্পষ্ট প্রকাশের মত!

বিকালকে সন্ধ্যা বলে' ভুল হয়। আলো জ্বাল্‌তে ইচ্ছা করে না, অথচ আব্‌ছায়া অন্ধকারে থেকে মনটা উৎসাহহীন হয়ে আসে।

—বিষ্টি নামছে বোধ হয়, এ সময় রাস্তায় নাম্‌বে মানুর মা?

—না মা, এই ত বেশী দূর নয়, তিন মিনিটের পথ! ওই বাঁদিকে খানিকটা গিয়েই মোড়ের মাথায় বড় বাড়ীটা। উপেনবাবুকে ও-পাড়ায় সবাই চেনে। আসি বৌমা তবে, রান্নাঘরে সব ঢাকাঢুকি রইল!

মানুর মা চলে' গেল।

বাড়ীতে কেউ নেই। একটু আগে পাশের প্রতিবেশীর উচ্চকণ্ঠের আলোচনা সবেমাত্র থেমে গেছে। মেঘের একটি ছায়া সমস্ত বাড়ীটিকে অন্ধকারে ঘিরে ফেলেছে। একাকিনী আসন্ন সন্ধ্যাকে পাশে রেখে সুলতা থম্‌কে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল! অন্তরের নিবিড় অরণ্যের কোন্ গোপন বৃক্ষতলে কোথায় যেন একটি তার মধুচক্র রচনা হয়ে চলেছিল; নানা মৌমাছি নানান্ জায়গা থেকে উড়ে এসে সেখানে মধুসঞ্চয় করছে!

জলো হাওয়া বয়ে' চল্‌ল। আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত সুরু হয়ে গেল। দূর থেকে দূরে মেঘের গুরুধ্বনি মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। বাতাস বয়ে' চলেছে—চারিদিক থেকে বৃষ্টির ছাট্ এসে সব ভিজিয়ে একসা করে' দেবে বুঝি! চারিদিকের এই জলো হাওয়া, এই অসাময়িক দুর্যোগ,—সুলতা আগে কোন্ দিক আট্‌কাতে পারে! নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এদিক ওদিক সে তাকাতে লাগ্‌ল।

চোখে তার হু হু করে জল এসে পড়ল। এই সামান্য শক্তিটুকুও কি তার থাক্‌তে নেই? সকল দিক থেকে এই যে অবেলার দুর্যোগ দুর্নিবার হয়ে উঠল—এর থেকে তার ক্ষুদ্র নীড়টিকে বাঁচাবার এতটুকু সাধ্যও কি বিধাতা তাকে দেননি?

আলো জ্বালা আর হ'ল না! আলো জ্বাল্‌বে সে কোথায়? কোন্ ঘরে সে আলো দেখাবে?

সকরুণ নিশ্বাসের মত শব্দ করে' বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে। সুলতা দাঁড়িয়েই রইল, মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে সে কেঁদেই চলল! বৃষ্টিতে ততক্ষণে তার কাপড় চোপড় ভিজে উঠেছে!

দূরে কোথায় একটা বাজ পড়ার শব্দে সে সজাগ হয়ে সরে' এল

এ কি, এ যে অন্ধকার! স্বামী কি তার ঘরে ফিরেছেন? এ দুর্যোগে তিনি রইলেন কোথায়?

সুলতা আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না। একটা চাদর টেনে গায়ে-মাথায় মুড়ি দিয়ে সে নীচে নেমে এল। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সে রাস্তায় একবার উঁকি মারলে! এক আধটা গ্যাসের আলো মাত্র সেখানে জ্বলছে। জন-মানব কেউ নেই! অনেক দূরে ছাতি মাথায় দিয়ে একজন পথিক তাড়াতাড়ি চলেছে। সুলতা একবার তাকে ডেকে সত্যেনের সংবাদ জানবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখের আওয়াজ মুখেই রয়ে গেল।

নিরুপায় হয়ে সে ধীরে ধীরে পথে নামল। বাঁ-দিকের রাস্তাটা সহজ মনে করে' সেই পথেই চল্‌ল। একাকিনী পথে চলার কোনো সঙ্কোচ তার বিবেচনায় এল না। সত্যেনের খোঁজ করা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাই তখন তার মাথার মধ্যে নেই! পথে যেতে যেতেই সে যেন তার স্বামীর দেখা পাবে!

চল্‌ছে ত চল্‌ছেই! অনেকদূর অবধি গিয়েও কোনো চিহ্নই তার চোখে পড়ল না। পথটা একটা বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেল্‌ল। অতএব এ-পথ নয় মনে করে সে আবার ফির্‌ল। বৃষ্টিতে ভিজল, কাদায় পা ডুবে গেল, আঙুলে হোঁচট্ লাগল—কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সত্যেন তখন তার মনের দীর্ঘ দিগ্বলয়টি জুড়ে বসে রয়েছে।

এক জায়গায় এসে সে থাম্‌ল। কাছেই কোথায় নারীকণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গান সে বহুদিন শোনেনি। সঙ্গীত যে তার সকলের চেয়ে প্রিয়, এ কথা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। এই বৃষ্টি বাদল, এই অন্ধকার, এই একাকীত্ব এবং সকলের চেয়ে এই খোলা

পথের কিনারায় এমনি সামান্য রস-পিপাসায় দাঁড়িয়ে থাকা,—গৃহস্থের বধূর পক্ষে এ যে নিন্দনীয়, এ কথা তার এতটুকু মনে রইল না। আনন্দে তার চক্ষু প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, সঙ্গীতের মাধুর্য্যে সর্ব্বাঙ্গ তার রোমাঞ্চিত হয়ে এল, গায়ের রক্তের মধ্যে একটি উন্মাদনা সির্ সির্ করতে লাগ্‌ল,—মনে হল, ভিতরটা যেন তার নৃত্য করতে সুরু করেছে! তার লজ্জা, ভয়, অপমান, সুখ-দুঃখ—সমস্ত কিছুর গ্রন্থি একে একে তার গা থেকে যেন খুলে' খুলে' খসে পড়তে লাগল!

—আপনি কি রাস্তা হারিয়ে গেছেন?

পরিচিত গলার আওয়াজে ফিরে তাকাতেই একেবারে উপেনের সঙ্গে মুখোমুখি।

এ কি, আপনি? এখানে? এখানে দাঁড়িয়ে কি জন্যে

মাথার কাপড়টা খুলে গিয়েছিল, সুলতা কাপড় টেনে মাথায় ঢাকা দিল।

পথে এত রাতে,—আপনি মেয়ে ছেলে হয়ে,—ওদিকে কি দেখছিলেন? ছি, এখানে দাঁড়াতে নেই,—আসুন না, এই ত' আমার বাড়ী। আমার বাসাই বুঝি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন?

সুলতার আর বাক্‌শক্তি ছিল না। আস্তে আস্তে উপেনের পেছনে পেছনে এসে দরজায় উঠল। দরজা ভেজানই ছিল, দুজনে ভেতরে এসে বাইরের ঘরে ঢুক্‌ল। সুইচ্‌টা টিপে আলো জেলে উপেন বল্‌ল—এমন আশ্চর্য্য জীবনে আমি আর কোনদিন হইনি। এই রাতে রাস্তায় যে আপনাকে কুড়িয়ে পাওয়া যাবে, এ স্বপ্নের অতীত। আমার এখানেই কি এসেছিলেন?

সুলতা এবার কথা বল্‌ল—ওঁর আজ দুদিন খোঁজ নেই। চুপ করে তাই আর থাকা গেল না।

ও, আপনার স্বামীর কথা বলছেন। কিন্তু এই দুর্যোগে···আপনি স্ত্রীলোক···ঘরের বাইরে বেরোনো কি উচিত হয়েছে? আপনার কি ভয়-ডর নেই? ঘরে বুঝি মন টেঁকৃছিল না?

গিছলাম অনেক দূরে—সুলতা বলল—তারপর এই দিক দিয়ে আসতে আসতে···কেমন গান হচ্ছে শুনলেন না?

গান আমি রোজই শুনি। আজ একটু বেরিয়েছিলাম ···বাড়ীতে আজ কেউ নেই, সবাই নেমন্তন্নে গেছেন, মানুর মা বোধ হয় ওপরে ঘুমুচ্ছে! পথে আসতে আসতে বিষ্টি এল, তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। এলাম আপনার দরজার সুমুখ দিয়েই।

অবস্থা উপেনের ভালই, সুসজ্জিত ঘরখানির চারিদিকে তাকালে এই কথা মনে হয়। একটি পরিচ্ছন্ন আধুনিক জীবনের ছাপ রয়েছে।

খোঁজ ত পেলেন না, এবার কি করবেন।

এবার? সুলতা বলল—তাই ভাবছি?

উপেন বলল—আপনি অদ্ভুত! সেদিন আপনার ওপর বোধ হয় একটু রাগ করেই চলে এলাম। কিন্তু আজ এই বর্ষায়, অন্ধকারে, এই একলা ঘরে আলোর নীচে, সবার চোখের আড়ালে আপনার ওপর আর সে রাগ থাকছে না! আচ্ছা, এমন কেন হয় বলুন ত দেখি?

সুলতা শুন্‌ল, শুনে গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল—আমিও সেই কথা বলব আপনাকে ভাবছিলাম।

একটু ঝুঁকে পড়ে উপেন বলল—কি?

না, এই ওঁর কথা বলছি। বলছিলাম ওঁর ওপর রাগ করতে নেই! সব সময় ওঁকে আমরা বুঝতে পারি না তাই এক এক সময় রাগ করে বসি। ওঁকে যে জানে সে আর কাউকেই চাইবে না!

ও, এই কথা!—উপেন উদাস হয়ে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটি

তৈল চিত্রের প্রতি তাকিয়ে রইল। দুনিয়ায় তার আর যেন কোনো স্পৃহাই নেই।

—দেখুন, আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, ওঁর কথা আর আপনি মনে রাখবেন না!

উপেন একটু ম্লান হাসি হাসল। বলল—আমাকে আর লজ্জিত করবেন না, ব্যাপারটা হল আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। আমি ত পর, বাইরের লোক, আমার ভারি খারাপ লেগেছিল তাই দু'চার কথা,—আপনার যে অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে! এবার না হয় উঠুন আস্তে আস্তে।

ওঠবার কোনো লক্ষণই সুলতার দেখা গেল না বরং উপেনের মনের ওপর আর একটু দাগ রাখবার চেষ্টায় সে বলল—কি রকম ভাবে উনি দিন কাটাচ্ছেন মনে করলে আমার সত্যিই কান্না পায়! সবই আমার দোষ, আমার জন্য তাঁকে এত দুঃখু পেতে হল!

এই মেয়েটির ওপর বিতৃষ্ণা জাগাই উচিত ছিল কিন্তু অপরিসীম মমতায় উপেনের মনটা ভরে উঠতে লাগল। বলল—দোষ যদি আপনার হয়েই থাকে, তার ক্ষমা করা উচিত। আপনাকেও সে ভাল করে' চিনতে পারে নি!

একটি অপূর্ব্ব আনন্দে এবার সুলতা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল! বলল—এই হচ্ছে ঠিক কথা, আপনি ছাড়া এ কথা আর কেউ বলতে পারত না। আমার নিজের কথা অন্য কেউ বললে আমার খুব ভাল লাগে। এই জন্যই আমি আপনাকে—

উঠে দাঁড়িয়ে সুলতা ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেওয়ালের ছবিগুলি দেখতে লাগল।

ভিজা কয়েকগাছি চুল তার মুখের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

মুখের একটা পাশ দিয়ে টানা চোখের একটা ধার দেখা যাচ্ছিল,—সে চোখ আগেকার মতই কাজলের রেখা টানা। হাত দুখানি নিটোল, মসৃণ, চাঁপার কলির মত আঙুলগুলিতে লাল আভা। তারই আগায় দুগাছি চুড়ি চিক্ চিক্ করছে। পায়ের আলতাপাটিতে কাদা লেগে কাদাও চিরকালের মত ধন্য হয়ে গেছে!

অনেকখানি সঙ্কোচ সত্ত্বেও উপেন তার দিকে এক-একবার মুখ না ফিরিয়ে থাকতে পারছিল না।

বাড়ী ত আপনাকে ফিরতেই হবে, না কি?—উপেন বলল—এখানেও একা সেখানেও একা!—

যারা নিমন্ত্রণে গিয়েছিল তাদের ফেরবার সময় হয়েছে। উপেন তাতাতাড়ি বলল—চলুন, আপনাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। কেউ এসে আপনাকে এখানে দেখলে—আমার চরিত্র সম্বন্ধে আমার আত্মীয় স্বজনের ধারণা তেমন ভালো নয়।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দুজনে বাইরে এল! বৃষ্টি তখন ধরে' গেছে—আকাশে আর মেঘ নেই! তারা জ্বল জ্বল করছে।

পাশাপাশি চলতে চলতে ভিজাচুলের গন্ধ উপেনের নাকে আসতে লাগল। নারী অঙ্গের একটি মৃদু সূক্ষ্ম সৌরভ তাকে একটু একটু করে' বিহ্বল করে' তুলছিল।

কম্পিত কণ্ঠে উপেন পথ চলতে চলতে বলল—এমন করে' আর ক'দিন চলবে আপনার? কি আশায়, কি লক্ষ্য নিয়ে আপনার দিন কাটবে বলতে পারেন?

সুলতা অন্ধকার আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখল কিন্তু কোনো উত্তরই আর মুখে এল না।

বাড়ীতে তাকে পৌছে দিয়ে এসে উপেন সহজে আর ফিরল না।

সেই রাতে লক্ষ্যহীন হয়ে অনেক দূর সে হেঁটে গেল। হাঁটতেই তার ভাল লাগছিল। যে বস্তুটি তাকে ঘর ছাড়া করেছে, পথ চলে চলে সে তাকে খইয়ে দিতে চায়। এ তার আনন্দের আবেগ, কি বেদনার বোঝা কে জানে! অনুভূতির সমস্ত তারগুলি একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ করে' বেজে উঠে তাকে যেন বিভ্রান্ত করে' তুলেছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, বাতাস, আলো, অন্ধকার—সমস্ত একাকার ওলটপালট করে' তার চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল।

সে রাতে আর তার ঘুম হল না। খোলা ছাদের ওপর পায়চারি করে' করে' ক্লান্ত হয়ে সে যখন কিছু প্রকৃতিস্থ হল,—গগনের পূর্ব্বপ্রান্ত তখন লাল হয়ে উঠেছে। শুকতারাটি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল।

স্পষ্ট আলোয় চারিদিক যখন ছেয়ে গেল, উপেন তখন গত রাত্রির বিভ্রান্ত মনের কথা ভেবে লজ্জিত হয়ে উঠল।

খানিক বেলায় সে যখন চা খেয়ে সবেমাত্র উঠেছে, মানুর মা তখন ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

ঊর্দ্ধশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে বলল—সময় নেই, আপনি এখুনি একবার চলুন বৌমার কাছে।

কেন মনুর মা?

বৌমা ডাকছেন, আমি চললাম···আর দেরি করবেন না···বলবার সময় নেই।

মানুর মা ছুটছে ছুটতে আবার বেরিয়ে চলে গেল। জুতোটা কোনমতে পায়ে দিয়ে উপেন পথে নেমে বলল—আরে দাঁড়াও মানুর মা, দাঁড়াও—কি হল শুনি? কোথাও কিছু নেই, তুমি একেবারে ঘোড়ায় চড়ে' এসে···ও মানুর মা?

ওই আপনার দোষ বাবু, পিছু ডাকা···আসুন বলছি!

বাড়ীতে ঢুকে সটান্ গিয়ে উপেন ওপরে উঠল। সুলতা শশব্যস্তে এসে কাতর কণ্ঠে বলল—বাড়ীতে ফিরে কাল তেতলার ঘরে দুম্‌দাম্ শব্দ শুন্‌ছিলাম···উনি ওই ঘরেই থাকেন কিনা, অতটা বুঝতে পারিনি ···দরজা বন্ধ, কিছুতেই খুলছেন না—এত ডাকাডাকি—কোনো সাড়া নেই। কাল আপনার ওখানে যখন গিছলাম উনি বাড়ীতেই ছিলেন—টের পাইনি।

তেতলায় উঠে এসে উপেন দরজায় ধাক্কা দিল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতেও দরজা খুলল না। পাশের বাড়ী থেকে অনেকেই উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগল।

উপেন বলল—কি করা যায়?

মানুর মা বল্‌ল—সবাই যা করে! দরজা না ভাঙলে এমন করে' ত আর থাকা যায় না! ভ্যালা সোয়ামি তোমার বৌমা! এত কষ্টও মানুষকে দিতে হয়?

দরজা ভাঙাই সাব্যস্ত হল। সাবল হাতুড়ি সাঁড়াসি এনে অনেক পরিশ্রম অনেক হুড়যুদ্ধ অনেক দাপাদাপির পর দরজা খোলা হল!

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে!

ঘরের সমস্ত আসবাবগুলি চূর্ণবিচূর্ণ, ভাঙা কাঁচ রাশি রাশি চারিদিকে ছড়ানো, আল্‌মারি ওল্‌টানো, জলের কুঁজো গড়াগড়ি, বিছানাপত্র লণ্ডভণ্ড,—আর তারই মাঝখানে খাটের ওপর থেকে আধখানা দেহ ঝুলিয়ে সত্যেন অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় বেঁকে চুরে কাৎ হয়ে রয়েছে!

পৃথিবীর আলো-বাতাস সে আর সইতে পারেনি, আকাশকে সে চিরদিনের মত নির্ব্বাসন দিয়েছে, সংসারকে সে কঠিন ব্যঙ্গ করে' গেছে,—মানব জাতির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় তার সেই ভয়ানক কদর্য্য মুখভঙ্গী

তখনও বিকৃত বিবর্ণ হয়ে ছিল। পুড়ে' পুড়ে' প্রতি মুহূর্ত্তে সে খাক্ হয়েছে, ঘৃণায় ঘৃণায় প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু তার বিষাক্ত হয়েছে, নিজের দেহই তাকে প্রতি পলে পলে নির্য্যাতন করেছে! জীবনের বোঝা সে আর বইতে পারেনি! বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কি উপায় ছিল!

কি দেখছেন? ও আর নেই।

সুলতা মুখ তুলে তাকালো। তার চোখের পাতা কাঁপছিল।

ঘাড় ফিরিয়ে উপেন পিছন দিকে তাকাতেই, মানুর মার চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে' জল গড়িয়ে পড়ল।

পাঁচ

শবদেহের সৎকার করে' অনেক বেলায় উপেন সুলতাকে নিয়ে ফিরে এল। হাতের চুড়ি দুগাছি মাত্র আছে, পরণে উঠেছে আপাতত শাদা থান, যে-সিঁদুর সত্যেন তার মাথায় আবার তুলে ছিল, সে-চিহ্ন আর নেই! চির-পরিচিত বিধবার সজ্জায় সে আবার আপনাকে প্রকাশ করল।

ঝড় থেমে গেছে—। আর বিদ্যুৎ চম্‌কায় না, মেঘ আর ডাকে না, মুষল-বৃষ্টিপাত আর হয় না। বাইরের সমস্ত দুর্য্যোগটা যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে ভিতরে মুহ্যমান হয়ে আছে।

মৃত্যু-যে শিকড়সুদ্ধ একটি গাছকে টেনে উপ্‌ড়ে নিয়ে গেছে তারই অস্ফুট বেদনায় সমস্ত বাড়ীখানা এখনও টন্ টন্ করছে। শোকের আওতায় চারিদিকটা ভারি,—থম্ থমে! এ বস্তু ঠিক বিরহ নয়,

বিচ্ছেদও নয়—এ হচ্ছে নিয়তির একটি অভিব্যক্তিহীন নিষ্ঠুরতা! এ বিয়োগ নয়—হত্যা; ত্যাগ নয়—লুণ্ঠন! মানুর-যে শুধু এর জন্যে চোখের জল ফেলবে তাই নয়—গৃহের চূড়ায় ক্লান্তিহীন কপোতের কণ্ঠ নিরন্তর এর প্রতিবাদ করে' চলেছে, শীর্ণ শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরে এর ক্রন্দনধ্বনি শিউরে শিউরে উঠছে, উদাস দুপুরের হাওয়ায় হাওয়ায় এর নিশ্বাস ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে যাচ্ছে! পলাশ ফুলের পথের কিনারা দিয়ে, অশোক আর শিমুলের বন পার হয়ে, রাঙা করবীর রেখা এঁকে এঁকে দস্যু একটী জীবনকে হরণ করে' নিয়ে গেছে। রক্তের দাগে সে পথ কলঙ্কিত!

শোকাচ্ছন্ন গৃহখানির করুণ আবহাওয়া মানুর মার কাছেও মাঝে মাঝে দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে, নিয়তির এত বড় অন্যায় সময় সময় তাকেও অকারণে চঞ্চল করে' তোলে। নির্জ্জন গৃহের নীরবতায় মানুর মা সহজে টেঁকতে পারে না।

কিন্তু সমবেদনা প্রকাশ করবারও এ যে উপযুক্ত সময় নয়, এখন যে তার কোনো মূল্যই নেই এ কথা মানুর মাও না-জানি কেমন করে' বুঝতে পারে! থেকে থেকে এক সময় সে বলে' ওঠে—শুন্চ? অ বৌমা, একটু নড়ে' চড়ে' ঘুরে ফিরে বেড়াওগে বাছা!

কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও সে দেখে বৌমা তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে। মুখ তুলে তাকাতেই সুলতার সঙ্গে তার চোখচোখি হয়! কিন্তু তার দৃষ্টি ওই এক রকমের! তাতে অর্থ নেই, আবেগ নেই, নিরানন্দের কোনো স্পষ্ট অভিব্যক্তি নেই,—বর্ষায় ধোয়া আকাশের মত এক রকমের ফিকে ঝাপসা চাহনি। কারো প্রতি তাকালে সে চাহনি বেঁধে না, আহত করে না—সে এমনিই নিরর্থক এবং নির্ব্বাক।

সাধারণ কাজ-কর্ম্মগুলি সেরে কাছে গিয়ে মানুর মা বল্‌ল—এ রকম করলে দিন কেমন করে' যাবে বৌমা?

তা বটে ! মানুর মার সাংসারিক বুদ্ধিকে সুলতা সম্মান না করে' পারে না। ভাগ্যি উপেনবাবুর এই ঝি-টি এ সময় ছিল !

যে-প্রশ্নটি নিরন্তর কাঁটার মত ভিতরে ভিতরে খচ্ খচ্ করে' বিঁধছে সেইটিই এবার সুলতা প্রকাশ করে' ফেলে—মানুর মা, কেন এমন হল বলতে পারো ?

মুক্তার মত দুটি ফোঁটা চক্‌চকে জল তার চোখে টল্ টল্ করে' ওঠে। মানুর মা ফোঁস করে' একটি নিশ্বাস ফেলে বলে—নিদ্দ্যীর শাস্তি বৌমা, একে আমরা বলি কপালের লেখা ! একে ছেড়ে মানুষের এক-পা এগোবার যো নেই

মানুর মা, ঠিক বলেছ তুমি। আমিও ভাবছিলাম···

সুলতার মুখে এর চেয়ে আর বেশী কথা যোগায় না। কি ভাবছিল তা সে নিজেই জানে কি না সন্দেহ।

সমস্ত দিনটি এমনি আবছায়া আলো এবং অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কেটে যায়। বাতায়ন-পথের আকাশ একটি অপূর্ব্ব গভীর মৌনতা নিয়ে সুলতার প্রতি তাকিয়ে থাকে। অস্তমান সূর্য্যের একটি বিষণ্ণ রক্তাভা—সুলতার সমস্ত রিক্ত মনের আকাশকে রাঙা করে' তোলে। আরতির শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনিতে সে একটি মহত্তর সঙ্গীতের আস্বাদন করে। ধীরে ধীরে আবার চারিদিকে রাত্রি ছেয়ে আসে। রজনীর এক-একটি তারাব নিঃশব্দ উদয়ের প্রতি তাকিয়ে সে এই অতি-পরিচিত, অতি-পুরাতন পৃথিবীর কথা ভুলে যায়। শুক্লা একাদশী তিথির চাঁদের ইতস্ততঃ সঞ্চরমান লঘু মেঘের দল তাকে অনেক দেশের অনেক গল্প শুনিয়ে চলে যেতে থাকে।

সুলতা এমনিই। অবলম্বন যখন তার আর কিছু থাকে না, এই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তার সমস্ত সত্তাগুলি আল্‌গা হয়ে চারিদিকে

ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাতাসের মৃদু চলাচলের মধ্যে, গাছের আগ্‌-ডালের কচি পাতাটির চারিপাশে, ছোট পাখীটির গতিভঙ্গীতে, ছোট ছোট লোকালয়গুলির চতুঃসীমানায়, আকাশের কোণে কোণে, উদয়াস্ত দিনমানের বিচিত্র লীলার মধ্যে তার মন বিচরণ করে' বেড়ায়। চারিদিক থে.ক যেন তার ডাক আসে, চারিদিক থেকে তাকে যেন টান্‌তে থাকে। একটি অদৃশ্য জগতের সঙ্গে সে যেন মিলে মিশে জড়িয়ে যায়।

মানুর মা তাকে এক দণ্ডও ছেড়ে যেতে পারে না।

—অ বৌমা. চুল ভিজে রাখলে যে কাসি হয় বাছা? দিনে চারবার করে' চান্‌ করলে কি শরীর ভাল থাকে?

—চুল ভিজে রাখলে অসুখ করে? ও!

সুলতা চুল খুলে দিয়ে বাইরে এসে ঝাঁটাটা নিয়ে মানুর মার দেখা-দেখি দালানটা ঝাঁট্‌ দেয়। শব্দ পেয়ে মানুর মা তাড়াতাড়ি এসে ঝাঁটাটা তার হাত থেকে নিয়ে এক মুখ হেসে বলে—এ কি মানায় তোমার হাতে বৌমা? আমি যতক্ষণ আছি—যাও, তুমি ঘরে যাও মা!

তা হোক না মানুর মা! সবাই সব কাজ করলে আর ত' কোনো গোলমাল হয় না!

পারব না বাছা, চোখে দেখ্‌তে পারব না—আমি থাকতে,—বলতে বলতে মানুর মা আড়ালে চলে যায়।

আড়ালে গিয়ে ঝাঁটাটা ধরে নিজের হাতের দিকে একবার সে তাকিয়ে দেখে! সুলতার পাশে হাতখানি তার অত্যন্ত শ্রীহীন মনে হয়!

পাছে হাতে হলুদ লাগে এজন্য বৌমাকে সে রাঁধতে দেয় না! জল তুল্‌তে গিয়ে পাছে বৌমার উঁচু-নীচুতে পা পড়ে' যায় এ জন্য শূন্য

বাল্‌তিগুলি সে নিজের কাছেই রাখে। সংসারের কোনো কাজেই বৌমাকে মানাবে না—এই ছিল মানুর মার বিশ্বাস! সুলতার রূপের দিকে তাকিয়ে কোনো কাজ তাকে হাতে তুলে দিতে মানুর মার লজ্জা হত!

এই মেয়েটির জন্য রাতে তার ঘুম নেই। কেমন করে এর সারা জীবন কাট্‌বে তাই ভাবতে ভাবতে মানুর মা দিশাহারা হয়ে যেত। এই কয়দিনে সে এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছে, বৌমার জীবনটি ঠিক লতার মত, একজনকে ভর্‌ না করে' সে কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না!

সকাল বেলায় উপেন এল। স্নান সেরে এলোচুলে মাথায় একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে সুলতা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল!

মুখ নীচু করে উপেন বল্‌ল—সত্যি বলতে কি, কি জানি কেন, আপনার কাছে মুখ দেখাতে পারিনে। বন্ধুর স্ত্রীর দুঃখ বন্ধুরই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী লাগে! আর এখানে সান্ত্বনা দেওয়া আরো বেশী বিড়ম্বনা! উঃ—আত্মহত্যার কথা আমি ভাবতেই পারিনে! কি দুঃখে যে মানুষ নিজের জীবনকে নষ্ট করে' বসে, নিজের হাতে কেমন করে' সে বিষ তুলে খায়—মনে করলেও গা শিউরে ওঠে।

সুলতা মাথা হেঁট করেই ছিল।

—সব চেয়ে ভালবাসে মানুষ নিজকে। একটি দিনও সে অনাহারে থাকে না, একটি কাঁটার আঘাতও সে সইতে পারে না, ছোট ছোট খানাডোবাটি পর্য্যন্ত সে বাঁচিয়ে চলে—নিজের দেহটি তার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়। দেহসর্ব্বস্ব জড় বলে যে আমাদের নিন্দা করে-তার চেয়ে ভণ্ড আর কেউ নেই। দেহই ত সব, দেহ নিয়েই যত গোলমাল, দেহ নিয়েই যত আনন্দ!

মানুর মা এদিকে আসছিল, দরজা পার হয়ে যাবার আগে সে এক-

বার থমকে দাঁড়িয়ে দুজনের দিকে তাকালো, তারপর ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে বলল—বুড়ো মানুষ, একলা সব কাজ করতে পারিনে বাছা, কুটনো গুলো তুমি কুটে দিয়ে এসো বৌমা!—ছোটবাবু তুমি একবার বাজারে যাও।

সুলতা ভেতরে চলে গেল। উপেন মানুর মাকে একটু সমীহ করে চলত। বলল! তাইত এলাম, বাজারে যাবার জন্যেই ত তাড়াতাড়ি চা খেয়ে ছুটে এলাম।

তাই যাও, ছুটে যাও! আবার বসে রইলে কেন? ওই তোমার দোষ বাবু—নিড়বিড়ে, নেই-আঁকড়া ধাত্।

কি যেন গরগর কর্‌তে কর্‌তে উপেন বেরিয়ে চলে গেল।

বেশী মাথামাথি মানুর মার সহ্য হয় না। অত কেন? ভেতরে এসে কলসীতে জল ভরতে ভরতে সে বলল—ভাল দেখায় না, যে যাই বলুক। ছোটবাবুকে আড়ালে সেদিন মানা করলাম, তবুও। আচ্ছা বুঝলাম অসময়ে উপকার করেছো—বেশ! তা বলে' পরের ঘরের বৌয়ের কাছে এমন নেপ্টে থাকা—পয়সা অলা বড় মানুষ বলে' আমি ত আর দোষ ঢাকতে পারিনি। চাকরি যায় ত যাক্, ভিক্ষে করে খাবো। আর বৌমাকেও বলি—

বলতে বলতে অদূরে সুলতার সঙ্গে চোখচোখি হতেই মানুর মা থেমে গেল। নির্ব্বিকার বিস্মিত দৃষ্টিতে সুলতা তার প্রতি এতক্ষণ তাকিয়েছিল। মনে হল কোন ইঙ্গিতই সে বুঝতে পারেনি!

ওমা না, ও যে নির্দ্দোষীর চাউনি, তোমায় আমি কিছু বলিনি বৌমা, আমায় মাপ কর!

আলুর সঙ্গে পটল কুটবো মানুর মা?

মানুর মার শীর্ণ কুশ্রী মুখখানি আনন্দে মুহূর্ত্তের মধ্যেই একেবারে

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে সুলতার চিবুকটি হাত দিয়ে নেড়ে চুম্বন করে বলল—তাই কুটে দাও!

মানুর মা মানুষ চেনে।

উপেনের প্রতি তার নজর ছিল একটু কড়া কিন্তু সুলতার সম্বন্ধে সে ভুল করেনি। চাহনির আলোতে মানুষের ভিতরটা সে দেখতে পায়।

মানুর মার অভিজ্ঞতা কারো চেয়ে কম নয়।

রোদ উঠল মানুর মা? শেষ-চৈত্রের প্রাতকালে সুলতা একদিন জিজ্ঞাসা করে।

তা উঠবে বৈকি বাছা, সকাল হল যে!

ও! আচ্ছা মানুর মা, ঘাসের ফুল লাল হয়? রাঙা? আর সিঁদুরে মেঘ দেখেছ? গেরুয়া রঙের ধুলো?

মানুর মা বিপন্নের মত তার দিকে তাকায়। বৌমার এমন মাঝে হয়, কেন কে জানে। কোনো জবাব তার মুখে আসে না। সুলতা যেন প্রতিদিন একটি নূতন জগতে জন্মগ্রহণ করে। চারিদিক যেন ক্ষণে ক্ষণে তাকে বিস্মিত-বিভ্রান্ত করে' তোলে।

বুঝ্‌লে মানুর মা, কাল স্বপন দেখলাম···নদীতে নাইতে গেছি···জল ছল ছল করছে, নদীর ওপর বর্ষা নেমেছে, বটগাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর···উঃ জলের ওপারে কী মেঘ জমে' উঠেছে তা আর কি বলব,—যাঃ নৌকোখানা ডুবে গেল বুঝি? জলের ওপর এত ঝড়-বৃষ্টি?

বলতে বলতে মুখে-চোখে সুলতার রক্ত জমে উঠ্‌ল।

তারপর বৌমা?

তারপর দেখি তুমি দাঁড়িয়ে! মানুর মা—বলতে বলতে সুলতা মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

কি মা?

দেখলাম তোমার পরণে রাঙা সাড়ী, মাথায় টকটকে সিঁদুর, হাতে,—আর প্রতিমার মতন তোমার কী রূপ!

মানুর মা ততক্ষণে আড়ালে চলে' গেছে। আড়ালে গিয়ে লজ্জায় এতখানি জিব বার করে' মনে মনে বলল—ছি ছি, বৌমার মুখে কিছু আট্‌কায় না, বিধবা মানুষকে···রাম রাম!

ও মানুর মা, শুন্‌চ? আবার যে বাতাস উঠ্‌ল—যাঃ দিলে বুঝি সব ওলোট পালট করে'। যাই—

ছুটতে ছুটতে ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে জান্‌লা দরজা বন্ধ করে' দিতে লাগল। চোখে ততক্ষণে তার ঝর ঝর করে' জল নেমে এসেছে!

মানুর মাকে নিয়েই তার দিন, মানুর মাকে নিয়েই তার রাত। সমস্ত দিন ধরে' মানুর মার কাছে যে-কথাগুলি সে শোনে, অতি নিভৃত সঙ্গোপনে সেগুলি তার ভিতরে গুঞ্জন করে; মানুর মার কর্ম্মজীবন নিয়েই এখন তার যত আলোচনা, মানুর মার আত্মকাহিনীই এখন তার জীবনের গীতা! মনে হয়, সভ্য-সমাজের উপেক্ষিতা এই স্ত্রীলোকটির ছোটখাটো দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে তার অন্তরের একটি সূক্ষ্ম এবং নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে! পরের প্রতি মানুর মার এই অনাহূত মমতার নিষ্ঠা এর কাছে শ্রদ্ধায় সুলতার মাথা অবনত হয়ে আসে। ফুল যেমন বোঁটাকে আশ্রয় করে' চলতে থাকে সুলতা তেমনি মানুর মাকে আশ্রয় করে' দিন কাটায়। সমস্ত দৃষ্টিকে ছেয়ে মানুর মা-ই সংসারে এখন তার একমাত্র অবলম্বন।

সন্ধ্যার সময় উপেন রোজই একবার করে' ঘুরে যায়। সুলতা তার কাছে যেন একটি সুকঠিন প্রশ্ন! প্রতিদিন এই প্রশ্ন জটিলতর হয়ে তার কাছে দেখা দেয়। এর উত্তর আর আবিষ্কৃত হয়ে ওঠে না।

শোবার ঘরের একটি চৌকীর ওপর বসে পড়ে সে বলে—হিঁদুয়ানি আপনার নেই দেখছি. এক পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা থাকলে তবু যাতায়াতের একটা কারণ বোঝা যেত।

সুলতার আড়ষ্ট জিবটা সামান্য একটু আলগা হয়। বলে—এই গরমে চা ?

ওই একটি জিনিস—বুঝলেন ? আমাদের মতন পথো-জীবকে বাঁচিয়ে রাখে। উপুঁসি ছারপোকা, ওটা দিয়ে নাড়িভুঁড়িগুলোকে একটু সতেজ রাখি। তা ছাড়া ওটা ত ঠিক আহার নয়, নেশা! নেশার কি আর সময়-অসময়, গ্রীষ্ম-বর্ষা আছে ?

চা খাওয়াটা তেমন ভাল নয়!

নয় ? বলেন কি ? বদ্ উত্তেজনা আন্‌তে, দেহটাকে বারুদের মতন তৈরী করতে, খেয়ালের প্রশ্রয় দিতে অমন আর নেই!

তাতে লাভ কি বলুন।

বাসরে, আজ অনেক কথা ভাঙচেন যে! আমাকে একবার নাড়া দিলে অনেক কথা ঝরে' পড়ে। লাভ আছে বৈকি, আমরা হচ্ছি ভবঘুরে বাউণ্ডুলের দল,—বন্ধু, স্ত্রী. বৌদি কিম্বা মামাতো-পিসতুতো বোনের দলে গিয়ে আসর জমাতে হয়, প্রেমের একটু আধটু চর্চ্চাও মাঝে মাঝে চলে,—চায়ের নিভৃত আসর নৈলে এগুলোর সুবিধে কোথায় বলুন! চা হচ্ছে আজকালকার আধুনিক প্রেমের অনুপান!

সুলতা একটুখানি হাসল। বর্ষায় ভিজা আকাশে যেন একটু রোদ্দ খেলা করে গেল।

—এসেছিলাম, যাই এবার! ভয় হয়, পাছে মানুর মা গোয়েন্দা গিরি করে। সাজ গোছ করে বাড়ী থেকে সন্ধ্যাবেলায় বেরোলাম, অথচ বেরিয়েই মনে হল, তাই ত, যাই কোথায়। বন্ধুর বাড়ী? রাম বল! সরকারি বাগানে? ছি ছি, শেষকালে চাঁদের আলো দেখে রাত কাট্‌বে? সত্যি বলছি আপনাকে, রাতের বেলা চাঁদ উঠ্‌লে মুখচোরা হাওয়া বইলে মনে হয় পৃথিবীটা যেন মূর্ত্তিমান ন্যাকামি! পৃথিবীর বাইরে কোনো রকমে যদি একবার যেতে পারতাম ত ধরিত্রী দেবীর গালে একটি সজোরে চপেটাঘাত করে আসতাম!

সুলতা বলল—আপনার সাহস ত কম নয়!

উপেনও হাস্‌ল—হেসে বলল—এটা সাহস নয়, পাগলামি। মাঝে মাঝে এমনি কতকগুলো পাগ্‌লামি আমার ঘাড়ে চেপে বসে। এর কোনো হদিস পাইনে। একটা অতৃপ্তি সমস্ত দেহের মধ্যে চরে' বেড়ায় —হ্যাঁ, ঠিক এই রকম! কেবলই একটা অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে খচ্‌ খচ্‌ করছে! বোধ হয় এমন একটা কিছু চাই যা কোনো দিন ফুরোবে না, এমন একটা আনন্দ যার বৈচিত্র্য হারাবে না, পুরোনো হবে না!

কি সেটা?

হা ভগবান! মাথা নেড়ে উপেন বলল—তাই যদি জানবো তা হলে আপনার কাছে যখন তখন এসে এমন বক্তৃতাই বা দেবো কেন? যেটা চাই সেটা পাচ্ছিনে বলেই ত তার ওপর এত টান, এত দরদ, এত খোঁজাখুঁজি! যদি জানতেই পারব কী সেটা তবে ত সব গোলমালই মিটে যায়। এদেশে আমরা একদল পতিত সন্তান আছি, যারা ক্ষ্যাপার মত এই দুনিয়ার কূলে সারা জীবন ধরে' পরশপাথর খুঁজেই সারা হল।

একটি অস্বস্তিকর নীরবতা কাটিয়ে সুলতা বলে উঠল—একটি সংসার করুন না?

সংসার ? তার মানে বিয়ে ? হরি হরি, সংসারের দিকে সমস্ত মন পড়ে' রইল কিন্তু ভোগ যে তৃপ্তি দিল না ! পাখীর বাসা বাঁধবো, কিন্তু ঝড়ের কথাই যে আগে ভাবি। তা ছাড়া উধাও হয়ে যে উড়েই চলল, বাসা ত তার পথ চেয়েই থাকবে !

কিন্তু স্ত্রী কাছে থাকলে—

স্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রীলোক ?···ভাল লাগে না ? স্ত্রীলোক শুধু বাঁধনের গানই গাইবে, মায়া রচনা করবে, কিন্তু আত্মার খোঁজ সে কি জানে ! সে যে চীৎকার করে' করে' গলা চিরে রক্ত বা'র করছে, তাকে সান্ত্বনা স্ত্রীলোক দেবে কি করে' ? সে কি স্ত্রী চায় ? না ঐশ্বর্য্য চায় ? তার কাছে সন্ন্যাসও মিথ্যে, ভগবানও কথার কথা !

উপেনের কণ্ঠে ছিল রসিকতার সুর, এখন এল গাম্ভীর্য্য ! নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর ঘুরে ঘুরে দেয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি করে' মিলিয়ে যেতে লাগল।

সেদিন অনেকক্ষণ সে এমনি করে' কাটালো।

—উঠি তবে আজকের মতন,—আসি !—হাত ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে ছড়িটা হাতে নিয়ে উপেন বাইরে বেরিয়ে এল।

চা খাওয়া হল না যে ?

উপেন পিছনে তাকিয়ে হাসলো। বলল—সত্যি কি খেতাম ? ও একটা ছুতো, নৈলে আপনাকে দেখতে আসবো কোন্ ছলে ?

আপনাকে বোধ হয় আলো দেখাতে হবে, ভারি অন্ধকার।

আলো ?—একটু হেসে উপেন বলল—না থাক্, পথটা আমার চেনা হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

রাত্রি অন্ধকার—। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্বলতার চোখে সেদিন ঘুম

এল না। ওর ঘর থেকে মানুরমার নাক ডাকার শব্দ থেকে থেকে কানে আসছিল। আলোটা টিপ্ টিপ্ করছিল এতক্ষণ এবার নিবে গেল, নীচে কোথায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার মৃদু একঘেয়ে শব্দ অন্ধকারকে ক্ষত-বিক্ষত করছে!

সুলতা পাশ ফিরে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে শু'লো। মনে হচ্ছিল, উপেনের এক-একটি কথা তার মনের প্রত্যেকটি তারে আঘাত ক'রে ঝঙ্কার তুলেছে। উপেনবাবু লুকিয়ে থেকে নিজেকেই খুঁজছেন। এ খোঁজা কি তার শেষ হবে না? আহা বেচারী!

ভারতে ভারতে সুলতার চোখ বুজে এল!

গভীর রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল! শব্দ—হ্যাঁ, এইমাত্র খাটের সুমুখ থেকে দরজার গোড়া দিয়ে ওই যে পায়ের শব্দ বাইরে গিয়ে মিলিয়ে গেল! সুলতা উঠে বসল। যে এসেছিল সে-যেন তার একটি নিশ্বাস ঘরের মধ্যে রেখে গেছে। দরজাটা বোধ হয় একটু নড়ে উঠছিল; ওই যে তার গায়ের হাওয়া লেগে কাপড়খানা এখনও দুলছে। মেঝের ওপর পায়ের দাগ রেখে গেল কি? কি একটি কথা বলে চলে গেল, কণ্ঠস্বরটি সুলতা এখনও যেন অনুভব করতে পারে!

রাত্রির এই অন্ধকারে সে কি সুলতার বিছানার চারিদিকে নিঃশব্দে পায়চারি করে' গেল? দৃষ্টি কি তার করুণ-কাতর? আত্মা কি তার তৃষ্ণার্ত? হয়ত তার জীবনের সমস্ত দুরাশাগুলি পদ-দলিত হয়ে গেছে, হয়ত সে প্রেমের প্রচণ্ড অপমান সহ্য করছে—অসমাপ্ত ভোগের পিপসাকে চারিদিকে সে কি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে? চোখের জলও কি ফেলে গেল দু ফোঁটা?

সুলতা উঠে আস্তে আস্তে বাইরে এল। অদৃশ্যের পদধ্বনি অনুসরণ

করে’ কয়েক পা এগিয়ে সে আবার ফিরে দাঁড়াল—কোথায় যাবে সে অন্ধকারে ? কার পদধ্বনি ?

পাশের ঘরে ঢুকে হেঁট হয়ে মানুরমার গা ঠেলে বল্‌ল—শুন্‌চ, ও মানুর মা ?

মানুরমার ঘুম বড় সজাগ। ধড়মড় করে’ উঠে বসে বল্‌ল—কেন গা বৌমা ?

রাত কি এখনও শেষ হয়নি ? সকাল হবে কখন্ ?

সকাল হলে আমার আপনিই ঘুম ভাঙত, ডাকতে হবে কেন মা ?

তা বটে ! সুলতা বল্‌ল—আজ তোমার খাওয়া হয়েছিল মানুরমা ?

ও মা ছি ছি—আজ যে একাদশী বাছা ?

তা বটে !

সকাল বেলা উপেন আসেনি। বিকাল বেলা আসতেই সুলতা বল্‌ল—আপনার অপেক্ষাই কচ্ছিলাম সারাদিন। আজ একটি সু-খবর আছে !

কি ?

এই নিন্।—আঁচলের ভেতর থেকে একখানি চিঠি বার করে’ উপেনের হাতে দিয়ে সুলতা আবার বল্‌ল—অনেক দিন বাদে দিদির খবর পেলাম !

চিঠিখানা খুলে উপেন পড়ল। দিদি আশীর্ব্বাদ করে’ পাঠিয়েছেন। অনেকদিন দেখা হয়নি, সত্যেন কেমন আছে, ছেলেপুলে হল কি না—এই সব !

চিঠি বন্ধ করে’ উপেন বল্‌ল—কি করবেন ?

যাবো তাঁর কাছে। দিদিকে না দেখে আর থাকতে পাচ্ছি না।

তাই চলুন—উপেন বল্‌ল—হাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে একবার ভাল

করে' নিশ্বেস নিন্ গে। কাল সকালেই কি যাবেন? ভোরের গাড়ীতে?

কথাবার্ত্তার পর পরদিন ভোরের গাড়ীতেই যাওয়া স্থির হল।

আপনাকে কিন্তু রেখে আসতে হবে, নৈলে যাবে কে বলুন?

তা যখন বলছেন তখন—আর আমি ছাড়া লোকই বা কই! কিন্তু আমার বাড়ীর লোকেরা আবার শুন্‌লে—আচ্ছা দেখি—

যাওয়া ঠিক হলো বটে কিন্তু মানুরমার চোখে এল জল। আড়ালে ডেকে নিয়ে সুলতাকে সে বল্‌ল ছোটলোক বলে আশীর্ব্বাদ আমার ছোট নয় বৌমা! আর দেখা হবে কি না হবে। ও-জন্মে মেয়ে হয়েই এসো মা, কিন্তু মাথাটা এনো পুরুষ মানুষের। ঝি হয়ে এবার তোমাকে রাখতে পারলাম না, এবার যেন কোলের ঝি করে' পাই! বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার আশীর্ব্বাদ আর করব না, শুধু বলি, তোমার চোখের জল যেন আর না পড়ে মা!

ছয়

দুধারে সুদূর অবারিত ফাঁকা মাঠ, তার কোলে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রাম বললে গুটি কয়েক গাছের জটলা, খান কয়েক পাতার চাল ছাওয়া কুঁড়ে ঘর, আঁকা বাঁকা গুটি দুই তিন পায়ে চলা পথ, এক আধটি আশপাশের জলাশয়, কচিৎ ছোট ছোট ধানের গোলা, শীর্ণকায় কয়েকটা গৃহপালিত পশু।

মাঝামাঝি উঁচু বাঁধানো পথে ট্রেণের লাইন চলে' গেছে।

ছোট গ্রামের ছোট ইষ্টিশান—।

গাড়ী এসে থামতেই একটুখানি সোর গোল শোনা যায়, দু একটি লোক নামা-উঠা করে, ঘণ্টার টুং টুং আওয়াজ কাণে আসে, একটি বাঁশী বাজে, তারপর ধূম উদ্গীরণ করে' আবার গাড়ী ছাড়ে। সমস্ত দিনে একখানি গাড়ী যায়, একখানি আসে, বাকী সব সময়টাই সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নিঝুম! গভীর রাতে নাকি ডাক-গাড়ী ছুটে যায় এই পথে।

দুজনকে নামিয়ে দিয়ে একটু আগে গাড়ীখানা চলে গেছে।

মাথার ওপরে ঠিক-দুপুরের রোদ চন্ চন্ করছে, বোধ করি বৈশাখের শেষ। আকাশ একেবারে মরুভূমির মত রুক্ষ, রিক্ত, ছায়ালেশহীন্। কোথাও একবিন্দু মেঘের চিহ্ন নেই। গাছপালাগুলি চারিদিকের এই অগ্নিকাণ্ডে আত্মসমর্পণ করে' ক্ষণে ক্ষণে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে ধূলো উড়িয়ে শুক্নো উপবাসী হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল।

খর-রোদ্রের আওতায় সুলতার পথশ্রান্ত মুখখানি হয়ে উঠেছে সিঁদুরের মত রাঙা। খোলা প্রকৃতির একটি স্নিগ্ধ ছায়া তার চোখ দুটিতে নেমে এসেছে। দূর প্রান্তর এবং অরণ্যরেখার সঙ্গে তার অন্তরের একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল।

কুলির মাথায় বাক্সটি তুলে দিয়ে উপেন বল্‌ল—আর দাঁড়িয়ে থাকে না, আসুন—রোদে মাটী ফাট্‌ছে। ঘামে একেবারে আপনি নেয়ে উঠেছেন!

প্লাটফরম্ পার হয়ে টিকিট-ঘরের সুমুখ দিয়ে দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘোড়ার গাড়ী এদিকে নেই, জনকয়েক স্থানীয় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এসে ঘিরে ধরল—'কুথা যাবেন? কুন্ গাঁ?

উপেন বল্‌ল—নন্দীপুর।

লন্দিপুর? আসুন তবে আমার গাড়ীতে। দ্যাড় টাকা দিবেন। আমার গাড়ী লন্দিপুরের। লতুন বিচেলী-পাতা গাড়ী বাবু—আসুন।

লোকটি ছুটতে ছুট্‌তে গিয়ে বলদ দুটোকে গাড়ীতে জুত্‌তে লাগল।

দুজনে এল তার পিছু পিছু। গাড়ী তৈরী হলে বাক্সটা ভেতরে দিয়ে উপেন কুলি বিদায় করে দিল। রোদের উত্তাপে দাঁড়াবার সাধ্য ছিল না। উপেন বল্‌ল—আর দেরী করবেন না, উঠুন—ওঠাও ত মুস্কিল দেখছি, সকলের সুমুখে মেয়েছেলের পক্ষে উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা করাটা একটু বিপজ্জনক। গায়ের উড়ুনিটা খুলে আড়াল করব নাকি?—ওহে, কী তোমরা দেখছ হ্যাঁ ক'য়ে দাঁড়িয়ে? যেন গিল্‌ছে! রূপ কি কখনো দেখনি?

অনেক চেষ্টা করে' উঠে স্বলতা ভিতরে গিয়ে বসলো। উপেনও উঠল, উঠে তার পাশে গিয়ে কোনমতে জায়গা করে' নিল।

পথ অনেক দূর—।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে ধূলো উড়িয়ে, খানা-খোপের চাকা বসিয়ে, উঁচু-নীচু অসমতল জমীর ওপর হেলে দুলে মন্থর গতিতে গরুর গাড়ী চলেছে। এ চলার মধ্যে একটি নিরুদ্বেগ অবকাশ আছে, দিবা-স্বপ্নের একটি ক্লান্ত সুর আছে, আবেশ বিহ্বলতার একটি ছন্দ আছে। এ পথ ফুরোবার আশায় বসে' থাকার একটি আরাম পাওয়া যায়, শেষ হয়েও শেষ হবে না, একঘেয়ে সুরের মত চলেছে ত চলেছেই! গরুর গাড়ীতে চড়লে যাত্রীর চোখে তাই তন্দ্রা আসে। এর গতি আছে কিন্তু বেগ নেই। মন উন্মুখ হয়ে থাকলে এ গতির মধ্যে একটি উদাস করুণ সঙ্গীত আবিষ্কার করা যেতে পারে।

দরমা আর বাঁকারি দিয়ে ঘেরা ছই। পুরু খড়ের বিছানার উপর দুজনে অনেকক্ষণ থেকে নিঃশব্দে বসে ছিল। গাড়ীর ঝাঁকানিতে মাঝে মাঝে গায়ে গা ঠেকেছে!

উপেন বল্‌ল—জায়গা থাকলে সরে গিয়ে বসতাম, গায়ে গা ঠেকে যাওয়া আমি মোটেই পছন্দ করিনে।

স্থলতা বল্‌ল—কি করবেন বলুন !

না, তাই বলছি, স্বভাবটা আমার ভারি বেয়াড়া। মানুষকে খানিকক্ষণ ভাল লাগে, সমস্তক্ষণ কাছে থাকলে আমি হাঁপিয়ে উঠি। নিতান্ত স্বার্থপর লোক আমি।

স্থলতা চুপ করে রইল। পথ আর ফুরায় না !

দেখুন, একটা কথা না বলে আর থাকা গেল না। দিদির কাছে কি বলে আমার পরিচয় দেবেন ? আমার সঙ্গে তো আর আলাপ নেই তাঁর ?

কি বলব বলুন ত ?

তাই ভাবছি। বাঙালী সমাজ স্বামীর বন্ধুকে নিয়ে বিদেশ যাত্রার কথাটা না সইতেও পারে। আমাদের দেশের মেয়েকে আমরাই সব চেয়ে অশ্রদ্ধা করি এবং সন্দেহ করি, তা জানেন ত ?

স্থলতা বল্‌ল—দিদি সে রকম লোক নন্‌।

তা জানি, শুধু ভয় করছি দিদির দেশটাকে। সাহসটাও ত নেহাৎ আপনার কম নয়, অল্পবয়সী বিধবা হয়ে স্বামীর বন্ধুকে নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন ! আপনি ভাল মানুষ বলে লোকে ত আর ভাল চোখে দেখবে না ! মানুরমা আমাদের এত চোখে চোখে রেখে শেষে কিনা এই সহজ কথাটা বেমালুম ভুলে মেরে দিল ! মেয়েরা এমনিই—'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো !'

স্থলতা বল্‌ল—তাহলে কি বলব ?

তাইত, কিই-বা বলবেন ! দেশের লোক পৌছে দিতে এসেছে—মেদিনীপুরের মেয়ে হলে আপনি একথা বলতে পারতেন, লোকে মুখ টিপে হাসত, আর কিছু জিজ্ঞেস করত না।

উপেন চিন্তিত মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

* * * *

একখানি ছোট গ্রামের কিনারা দিয়ে গাড়ী চল্‌ছিল। একধারে তালগাছ ছাওয়া রাস্তা, দূরে সমতল ভূমিটা উঁচু হয়ে আবার নীচের দিকে গড়িয়ে গেছে। বাঁ-দিকে মাঠের পথে একটা চাষা হুঁকো হাতে করে দুটো বলদকে তাড়িয়ে আন্‌ছে! শালিকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

—এ গাঁয়ের নাম কি গা?

সরস্বতী!

সরস্বতী? ও, তাই লক্ষ্মী-শ্রী নেই! বলি আর কত দূর হে?

আর তিন ক্রোশ বাবু!

গ্রাম পার হয়ে আবার মাঠে পড়ল। খোলা মাঠের হাওয়া ছইয়ের মধ্যে আগুনের হল্‌কার মত এক-একবার ঘুরে যাচ্ছিল।

উপেন বল্‌ল— মাঝখানে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, আপনার দিদি শুনে যে কি করবেন তাই ভাবছি।

সুলতা বল্‌ল—কাঁদবেন খুব।

সে ত' বুঝতেই পাচ্ছি। আপনার মুখে যতটা শুনেছি, মনে হচ্ছে তিনি আপনাদের কাছে অনেক আশা করেছিলেন। আশা মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে যায় কিনা!

কপালের নীচে চুলের গোছাগুলি সুলতার হাওয়ায় দুলছে! ঘামের ফোঁটাগুলি মুখের ওপর শুকিয়ে রয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। মুখে চোখে তার একটি সকরুণ মৌনতা ছবির মত ফুটে স্থির হয়ে রয়েছে। মনে হল এতদিনের এত ঝড়-ঝাপ্‌টা, এত গ্লানি, এত দারিদ্র—তার কোনো দাগই এ মেয়েটির মুখের মধ্যে নেই। দুর্নীতির বোঝা, কলঙ্কের কালিমা, এ মেয়েটির শুভ্র নিষ্কলুষ মুখখানিকে এতটুকু মলিন করতে পারেনি।

উপেন বল্‌ল—ভয় হচ্ছে না আপনার?

সুলতা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। উদাসীন দুটি চক্ষু তার তন্দ্রায় ভারি হয়ে এসেছে।

উপেন বল্‌ল—এই ধরুন লোকালয় ত নেই এদিকে···এক্‌লা চলেছেন আমার সঙ্গে, এত কাছাকাছি বসে রয়েছেন···ধরুন ওই গাড়োয়ানটাও কিছু জানে না আমাদের সম্বন্ধে,—আর তা ছাড়া আমাকে আপনার লোক বলবেন আপনি কোন্ হিসাবে! সাধারণ মানুষ বলেও ত নিজের ওপর আমার একটা অবিশ্বাস আছে।

সুলতা প্রতিবাদ করল না।

দেখুন, আপনি উত্তর দিন্—যা হোক্ একটা কিছু উত্তর দিন, আপনি চুপ করে' থাকলে আমার গায়ের গেরোগুলা আল্‌গা হয়ে এখুনি কাঁপুনি ধরবে!

খানিক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুলতা অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একবা'র মুখ ফিরিয়ে শুধু বল্‌ল—আজ সারাদিন আপনার কিছু খাওয়াই হল না!

কি কথার কি উত্তর! বাঁধা তারগুলি পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল! উপেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্‌ল—দেখুন, এই আত্মীয়তাগুলোকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, বিশেষ করে' আপনার মুখ থেকে। মানুষকে তোষামোদ করবার, খুসী করবার, অতিরিক্ত আত্মীয় ভাববার ইচ্ছাটা আপনার মজ্জায় মজ্জায় জড়িয়ে আছে।

সুলতা দুঃখিত হল, ধীরে ধীরে যেন মর্ম্মে মরে' যেতে লাগ্‌ল।

উপেন বল্‌ল—মাটীর পুতুল আমরা সবাই কিন্তু আপনাকে মনে হয় কাঁচা মাটী। ছাঁচ্ বদল করলেই আপনার চেহারা বদ্‌লায়!

অপরাধিনীর মত সুলতা মাথা নীচু করে রইল।

দিদিকে কাছে পেয়ে আমার সম্বন্ধে যে আপনি উদাসীন হবেন, সে ত' এখন থেকেই বুঝতে পাচ্ছি।

সুলতা এবার কথা বল্‌ল—আমাকে আপনি ভুল বুঝছেন।

মুখের একটা শব্দ করে' উপেন বল্‌ল—ভুল বুঝলেই হয়ত ভাল হতো! একটা কিছু অবলম্বন পাওয়াই হচ্ছে আপনার জীবনের চরম সার্থকতা!

বেলা পড়ে এসেছে। নন্দীপুরের পথ আর বাকি ছিল না। দূরে একটা তালের জঙ্গলের পাশে সূর্য্য হেলে পড়েছে। কাছাকাছি কোন্ গ্রামের কয়েকটা ছেলেমেয়ে কোলাহল করতে করতে এই দিক দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। মাঠের পূর্ব্ব পারে শালবনে একটু একটু অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

একবার মুখ বাড়িয়ে চারিদিকটা দেখে নিয়ে উপেন কবির ঢঙে বল্‌ল—সূর্য্যদেবের রাগ পড়ে' এসেছে, অনুরাগের রঙে একটু একটু করে' রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে আকাশটা। সন্ধ্যের আগে পৌছলে হয়!

কথাটা গাড়োয়ানের কানে গেল। বল্‌ল—আর দেরী নাই বাবু।

দেরী ত নেই!—সুলতার দিকে তাকিয়ে উপেন বল্‌ল—কিন্তু এ-পথ আমাদের পথ ভুলিয়ে কোন্ দিকে যে নিয়ে যাচ্ছে তা ত' বুঝতেই পাচ্ছিনে।—এ আবার কি হে গাড়োয়ান, পাতাল-পুরীতে নেমে যাচ্ছি যে!

একটি ছোট নদী শুকিয়ে গেছে। দুই তটের মাঝখানে বালির রেখা বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তারই ওপর অস্তমান সূর্য্যের আভা পড়ে' সমস্তটাই রাঙা হয়েছে। প্রান্তরের মাথায় আকাশে সন্ধ্যাতারাটি জ্বল জ্বল করছিল। গরুর গাড়ী গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এল সেই নদীর ওপর।

নদী পার হয়ে, কয়েকটি সুপারি গাছের সারির পাশ কাটিয়ে গাঁয়ের মধ্যে গাড়ী ঢুক্‌ল। একটু একটু মানুষের সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল! কোনো কুটীরের দীপশিখা সবেমাত্র জ্বলে উঠেছে। বাঁ-হাতি ছোট

একটা ইস্কুল-ঘর ফেলে রেখে গাড়ীখানা ধীরে ধীরে একটা অর্দ্ধশুষ্ক পুষ্করিণীর ধারে দিয়ে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

—নামুন বাবু লক্ষীপুর!

—তাই নাকি? বেশ এবার ভৃঙ্গী এল ভৃঙ্গার সঙ্গে নিয়ে!

নিজে গাড়ী থেকে নেমে উপেন সুলতার হাত ধ'রে নামাল। ইতিমধ্যেই ছেলে-বুড়ো গাঁয়ের কয়েকটা স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা ভিড় ক'রে তাদের পিছু পিছু এসেছিল। এই অপরূপ দুটি নরনারীকে এমন অনভ্যস্ত অপরিচিত গ্রামের পথে দেখে তাদের মুখে আর কথাই ফুটছিল না।

চৌধুরী বাড়ীটা কোন্ দিকে কেউ বলতে পারেন?

একজন প্রৌঢ় লোক এগিয়ে এল। সাহস করে' বল্‌ল—উই যে, যান—ওই হোথা! নয়ত আসুন আমার সঙ্গে—দেখিয়ে দিই! লোকটার উৎসাহ দেখে উপেন একটু হাসল। চল্‌তে চল্‌তে মুখ ফিরিয়ে চুপি চুপি বল্‌ল—সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে।

সুলতাও হাসল। বল্‌ল—মুখে আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না।

খানিকটা আঁকা বাঁকা পথ পার হয়ে এসে লোকটি বল্‌ল—বাড়ীর চাবি সঙ্গে এনেছেন ত?

উপেন বল্‌ল—তার মানে? বাড়ী কি তালা দেওয়া নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। জানেন নি বুঝি? কেউ ত নাই সেখানে?

দিদি নেই? দিদিকে চেনেন না আপনারা?

চিনিনি আবার? তিনি সকলেরই দিদি। গাঁয়ের লোক তার পায়ের ধুলো না নিয়ে জল খায় না। দিদির স্বামী এবার সন্নিসি হয়ে চলে যান সেবার—

উপেন বল্‌ল—কোথায় তিনি?

তিনি পরশু দিন চলে গেছেন এখান থেকে। হঠাৎ তীর্থে যাবার সঙ্গী জুটে গেল কি না—

সুলতার বুকের ভেতরটা গুর্‌গুর্‌ করে' উঠল। কম্পিতকণ্ঠে বল্‌ল—এতদুর আসা মিথ্যে হল?

ভয়ে এবং নিরুৎসাহে উপেনের গলাটাও শুকিয়ে উঠল। জড়িত কণ্ঠে শুধু সুলতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—এই বিদেশে এ অবস্থায় আপনাকে নিয়ে এখন কি করি? কোথায় যাই?—আজ ত' ফিরে যাবার গাড়ীও নেই!

ফিরে?—বড় বড় দুটি চোখ তুলে সুলতা বল্‌ল—আবার সেই বাড়ীতে? উঁহু—না আর সেখানে না!

গলার আওয়াজে উপেন চম্‌কে উঠল। পরনির্ভরশীলা সহায়হীনা এই মেয়েটির রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ তার চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে এল। বল্‌ল—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট ছাড়া মানুষের আর কোন পথ নেই এ-কথা আজ আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করলাম!

লোকটি একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। এবার কাছে এসে বল্‌ল—আপনাদের ফিরে যেতে হবে দেখছি। যদি অনুমতি করেন ত বলি—

কি বলুন?

গরমের ছুটিতে ছেলেদের ইস্কুল ঘর বন্ধ আছে; আজ সেখানে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমি সেখানকার মাষ্টার!

মরা দেহে প্রাণ ফিরে এল। সুলতা বল্‌ল—তাই চলুন না!

বেশ!—আবার দুজনে লোকটির পিছু পিছু চলতে লাগল। বাক্সটা কাঁধে দিয়ে গাড়োয়ানটা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছিল।

আবার সেই আঁকা বাঁকা পথ, সেই পুকুর-পাড়, সেই ছোট টির্‌টিপে মুদীর দোকান, মাটীর পাচিল-ঘেরা সেই তাড়িখানার অস্ফুট কোলাহল—

সমস্তটা আবার পার হয়ে এসে ইস্কুল-ঘরটা দেখা গেল। ছেলে-মেয়েরা হাঁ করে’ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল, আশপাশে গৃহস্থের মেয়েদের জটলা সুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারেও নারীর এই আশ্চর্য্য রূপের দিকে তাকিয়ে বারোয়ারি তলায় বসে বিধু ভট্টাযাযি হুঁকো টান্‌তে ভুলে গেলেন। নিতাইচাঁদ পথের ধারেই চুপ করে’ দাঁড়িয়েছিল,—এই মাসেই তার বিবাহ হবার কথা—সুলতার প্রতি তাকিয়ে নিজ বিবাহের প্রতি তার মনটা নিদারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

ইস্কুল-ঘরের রোয়াকের ওপর উঠে গাড়োয়ান বাক্সটা নামিয়ে দিয়ে আপনার প্রাপ্য চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে!

পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি জ্বেলে উপেন বল্‌ল—অন্ধকার যে! সাপ-খোপ নেই ত? জন্তু-জানোয়ার? একে পুরানো, তায় আবার এঁদোপড়া! ও মাষ্টার মশাই, কি হবে?

ঘরখানির চাবি খুলে দিয়ে লোকটি বল্‌ল—আজ্ঞে না, কোনো ভয় নেই। দাঁড়ান্ আমি আলো আন্‌ছি।

শুধু আলো নয়, সারাদিনই আজ হরি-মটর চল্‌ছে—ওদিকটার ব্যবস্থাও করবেন তাহ’লে। এমন পরমা সুন্দরী অতিথি পেলে আমিও এতক্ষণে মচ্ছব লাগিয়ে দিতাম!

আজ্ঞে, সে কথা কি আর বল্‌তে হবে? একটুকু দেরী হবে না, সকল ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি, এত আমার সৌভাগ্যি!—আর হ্যাঁ,—লোকটি কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—গরমের দিনে বিছানায় ত আর শু’তে পারবেন না—একেই গাড়ী থেকে নেমেছেন,—একটা মাদুর আর দুটো বালিশ আপনাদের জন্যে আনিয়ে দিচ্ছি!

উৎসাহে আনন্দে লোকটি আবার ছুট্‌তে ছুট্‌তে চলে’ গেল।

এতক্ষণ যে-কথাটা মনে হয়নি, এবার সেটা ভয়ানক চেহারা নিয়ে দু’জনের কাছে দেখা দিল। একটিমাত্র ঘর, কিন্তু তারা যে একা!

উপেনের মনে হলো, আজকের এই নিভৃত রাত্রি অতিক্রম করার মত কঠিন কাজ সংসারে আর কিছু নেই !

অন্ধকারে দুটি নরনারী তখন পরস্পরের দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে !

সাত

আলো হাতে করে' মাষ্টার মশাই আবার যখন ফিরে এলেন, তখন ঘুট্‌ঘুটি রাত।

উপেন তখনও তেমনি করে' হাতের ওপর মাথা রেখে বসেছিল, আর সুলতা ছিল পাশেই অন্ধকারে নিঃশব্দে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

রোয়াকের ওপর আলোটা রেখে পিছন দিকে তাকিয়ে মাষ্টার মশাই বললেন—নে, নামা—নামিয়ে রেখে চলে' যা, আমিও যাচ্ছি !

একটি বামুনের ছেলে দুখানি খাবারের থালা নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে আবার চলে' গেল।

উঠুন্ আপনারা, এই জল এনেছি বাল্‌তি করে'—মুখ হাত ধুয়ে বসে' পড়ুন।

উপেন একটুখানি হাসল। বলল—আলোটা আর একটু আগে আনলেই ভাল করতেন মাষ্টার মশাই, নিজের মুখের চেহারাটা একবার ভাব ক'রে দেখে নিতাম !

হেঁয়ালীটা সম্যক্ উপলব্ধি না করে' মাষ্টার মশাই তার মুখের প্রতি তাকিয়ে রইলেন।

উপেন আবার হাসল। হেসে বল্‌ল—আপনি যা ভেবেছেন অর্থাৎ ওই যে একটি মাদুর আর দুটি বালিশ এনেছেন বগলে করে,'—সুলতার

দিকে একবার তাকিয়ে সে পুনরায় বল্‌ল—আমরা তা নই, বুঝলেন না? —যাক্‌, এখনো আপনি হাঁ ক'রে তাকিয়ে! আপনি হয় সরল, নয়ত' বোকা। ক'বছর আপনি ছেলে চরাচ্ছেন মাষ্টার মশাই?

আমার ওপর কি রাগ করলেন?

রাগ? হাঃ হাঃ হাঃ—ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে অপনার নিজের ছেলে-বয়েসও কাটেনি দেখছি। রাগ করব কেন? বরং মনে মনে আপনার উপকারের একটি মূল্য দেবার চেষ্টা করছি।

মাষ্টার মশাই চুপ করে' রইলেন।

অনেকগুলি টাকা উপেন জামার পকেট থেকে বার করল! তারপর বল্‌ল—দান করে' আপনার এ উপকারের অপমান করব না; এই পুরানো ইস্কুল-ঘরটার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি, নিজের হাতে আপনি মেরামত করিয়ে নেবেন—নিন্‌ ধরুন!

মাষ্টার মশাই একবার সবিনয়ে বলবার চেষ্টা করলেন—বেশ ত, কাল সকালেই না হয়—

না, আর সকালে নয়, এই ক'ঘন্টার মধ্যে হয়ত' ভানুমতীর খেল হয়ে যেতে পারে! এখুনি আপনাকে এ টাকা নিতে হবে।—একটু হেসে আবার বল্‌ল—তা'ছাড়া সকালে আমার হাত থেকে এ টাকা নিতে আপনার প্রবৃত্তি নাও হতে পারে!—নিন্‌, হাত পাতুন!

টাকাগুলি হাতে করে' নিয়ে মাষ্টার মশাই থতমত খেয়ে দাঁড়ালেন।

যান্‌, আর একমিনিটও দাঁড়াবেন না! কৃতজ্ঞতা জানাবেন? ধন্যবাদ বরং ওগুলো কাল সাকালের জন্যে মুখস্থ ক'রে রেখে দেবেন।

মাষ্টার পিছন ফিরে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলেন। নির্ব্বাক সুলতার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে উপেন চট্‌ ক'রে বল্‌ল—শুনুন, একবার দাঁড়ান মাষ্টার মশাই—আচ্ছা, আপনার কন্যাদায় আছে?

আজ্ঞে না, আমার মেয়ে নেই।

নেই? হতে কতক্ষণ? আপনার অঙ্কশায়িনীর বয়স কত?

মাষ্টার ফ্যাল ফ্যাল করে' তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। উপেন আরো কতকগুলি টাকা পকেট থেকে বা'র করে' তাঁর হাতে পুরে দিয়ে বলল—আগে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এবার ছুট্তে ছুট্তে যান্! নৈলে খেয়ালী লোক আমি, বুঝলেন ত', দিয়ে আবার কেড়েও নিতে পারি।

মাষ্টার মশায় চলে' যাবার পর উপেন এসে আবার বস্‌ল।

কোথায় শেয়ালের গলার আওয়াজ পেয়ে গ্রামের কোন্ প্রান্তে কুকুর ডাকাডাকি করছিল। সারাদিনের পর খোলা মাঠের হাওয়া একটু একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সুমুখে কয়েকটা গাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সড়সড়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। শুক্‌নো মাটীর একটা রুক্ষ গন্ধে চারিদিকটা ভর ভর করছে। অনেকক্ষণ থেকে একটা ডাহুক কোথায় চীৎকার করছিল—একবার তার জর্জ্জরিত কণ্ঠস্বর অনেকটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে!

খেতে বসে উপেন বল্‌ল—রাত বড় অন্ধকার, অমাবস্যা কি না কে জানে!—ওকি, বসে' কেন? আরম্ভ ক'রে দিন্?

প্রদীপের আলোর দিকে তাকিয়ে সুলতা বসেই ছিল। বল্‌ল আগে আপনার হোক, তারপর—

মানে? এবার বুঝি আমার সুমুখে বসে' এটা খান, ওটা খান্ করবেন? না না, অধিকার যেখানে এতটুকু নেই সেখানে গোঁজামিল আমার ভাল লাগে না। হাতের কাছে পাখা থাকলে আপনি বোধ হয় বাতাস করতেও দ্বিধা করতেন না?

একটু থেমে উপেন আবার বলল—সুন্দরী মেয়ের কাছে যত্ন নেবার যে কাঙালপনা, সে জাতের ব্রহ্মচারী আমি নই; অভিজ্ঞতা আমার অনেক—আমাকে ভুল বুঝবেন না!

সুলতা কম্পিতকণ্ঠে বলল—আমি ত' তা মনে করিনি উপেনবাবু!

মনে আমি যে করি সুলতা দেবী। আমি যে কী এ আমার একেবারে মুখস্থ। বেশী বয়েস পর্য্যন্ত বিয়ে করিনি বলে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে কি ত্রুটি রেখেছি? কিন্তু তবুও বলি, সুন্দরী বন্ধু-স্ত্রী কিম্বা রূপসী বৌদিদি প্রভৃতি রস-সম্পর্কীয়ার সেবা-যত্ন নিয়ে নিজের ভেতরের উপবাসী মানুষটিকে তৃপ্ত করা—এ কাপুরুষতাকে চিরকাল আমি ঘৃণা করে এসেছি। বাঙালী মেয়ের মেরুদণ্ড ভয়ানক দুর্ব্বল সুলতা দেবী, আমি তাদের এতটুকুও বিশ্বাস করিনে।

খেয়ে দেয়ে উঠে যাবার আগে উপেন আবার বল্‌ল—আপনার সঙ্গে একটা ভয়ানক ঝগড়া করতে আজ প্রস্তুত ছিলাম, আপনার ওপর আজ ঘৃণা জাগারই প্রয়োজন ছিল।

সুলতা মুখ তুলে তাকালো।—কেন বলুন ত? কি করলাম? বুঝতে পারলেন না?—বলে' একটু হেসে উপেন ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ভেতরে পায়চারি করতে করতে বল্‌ল—অত্যন্ত সহজে মানুষ যে বস্তুটি জয় করতে পারে আমার পক্ষে সেটা অতিরিক্ত কঠিন।—ভিজে এঁদোপড়া গন্ধ. স্যাঁতসেতে হাওয়া—আশ্চর্য্য, এই নোংরা আবহাওয়ায় ঢুকে আজ কত দিনের কত কথা মনে পড়ে' যাচ্ছে। একটুখানি বাতাস, গাছের পাতার সামান্য শব্দ—এই লক্ষণগুলো ধরে' মানুষের মন কতদিনের কত স্মৃতির আনাচে কানাচেই ছোঁক্ ছোঁক্ করে' বেড়ায়!—আপনাকে প্রথম দেখার দিনটি মনে পড়ে' যাচ্ছে!

সুলতা কোনো উত্তর দিল না।

সেদিন কি ভেবেছিলাম কে জানে! গায়ের শাল মাটীতে লুটিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে, কোঁচা দুলিয়ে, চলনের ভঙ্গীতে মধু ঢেলে দিয়ে হেসে চলে গিয়েছিলাম! আজকালকার ছেলেরা এই সামান্য কথাটি বোঝে না, পুরুষের ছলা-কলা মেয়েরা অত্যন্ত ঘৃণা করে। ছলা-কলা যে মেয়েদের নিজস্ব! নিজের জঘন্য প্রবৃত্তির কথা ভাবলে নিজেই মাঝে মাঝে শিউরে উঠি।

উপেন চুপ করে' গেল।

খানিকক্ষণ পরে আলো হাতে নিয়ে সুলতা ঘরে এল। উপেন বল্‌ল—আপনি সরল মানুষ, আপনার সঙ্কোচ নেই, আমার কিন্তু দম আট্‌কে যাবে!—বলে সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

সুলতা বল্‌ল—আর একখানা ঘর থাকলেই ভাল হত!

মনে হয়েছে এতক্ষণে? আমি ভাবছিলাম আপনি বুঝি ভুলেই গেলেন! আর একখানা ঘরের জন্যে আজ এই রাতে দশ হাজার টাকার 'হ্যাণ্ড্‌নোট্‌' পর্য্যন্ত আমি লিখে দিতে পারি। হায় রে, সামান্য অভাবের সূত্র ধরে' মানুষ কত বড় সর্ব্বনাশই ডেকে আনতে পারে।

উপেন এসে এক জায়গায় বসে' পড়ল। আকাশের অগণন নক্ষত্র-রাজির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে কি ভাবতে লাগল কে জানে! আকন্দ ফুলের মৃত ভীরু গন্ধ কোথা থেকে তার নাকে আসছিল। আজকের রাত্রি সত্যিই অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বনের চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অক্লান্ত একঘেয়ে সুর একটি মোহজাল রচনা করে' চলেছে। সে মোহ মানুষের গভীরতর চেতনাকে বিহ্বল করে' তোলে।

মনে হল কতকগুলি হিংস্র বিষাক্ত সাপ উদ্যতফণায় তাকে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে! দশ দিকের এই সূচীভেদ্য অন্ধকার নিশ্চল স্তব্ধতায় একটি ভয়ানক উদ্বেগ নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে যেন তার প্রতি তাকিয়ে আছে। অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রম করেও নিজকে ঠাট্টা এবং বিদ্রূপ করে' উড়িয়ে দেবার শক্তি আর সে খুঁজে পাচ্ছিল না! ভয়ে আতঙ্কে তার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগ্‌ল। আজ যদি সে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানায় ত' তার সে মিনতি কোথায় গিয়ে পৌছবে? আকাশ ছেড়ে তার ভগবান কি এখনও পালায় নি?

সুলতা কখন্‌ এসে নিঃশব্দে পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিল। এবার বল্‌ল—রাত জাগ্‌লে অসুখ করবে না আপনার?

উপেন মুখ তুল্‌লো। বল্‌ন—অসুখ যদি করে, আপনার সেবা আমি নেবো না—যান্!

সুলতা থতমত খেয়ে বল্‌ল—মাদুর পেতে দিয়েছি, তাই বলতে এসেছিলাম।—এই বলে' সে আস্তে আস্তে ভেতরে এল! তন্দ্রায় তার চোখ জড়িয়ে এসেছিল।

শাদা চোখে চেয়ে থাকা এক রকম, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকা আর এক রকম। তন্দ্রার মধ্যে সত্য-মিথ্যায় জড়ানো যে-স্বপ্ন, যে-কল্পনা —তার একটি আবেশে আছে। উপেন ওই এক রকম করে' বসেই রইল। বসে সে কতক্ষণ ছিল কে জানে, গা ঝাড়া দিয়ে কোন্ এক সময় সে উঠে দাঁড়াল। উঠে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌লো—সুলতা তখন দেয়ালের গায়ে কাৎ হয়ে চোখ বুজে রয়েছে। চোখ দুটো টেনে টেনে উপেন তার প্রতি একবার তাকালো, এবং তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ—তারপর কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে বল্‌ল—ভাল করে' ছড়িয়ে শু'ন না গিয়ে?

সুলতা আচম্‌কা জেগে উঠে সরে' এল। মাদুরটা পাতাই ছিল, তার ওপর এসে বস্‌ল! উপেন বল্‌ল—কি করি বলুন দেখি?

চোখের ঘুম সুলতার ছুটে গেল, সে মুখ তুলে তাকালো।

উপেন কাছে বসে' পড়ে' বল্‌ল—আচ্ছা, মনে হচ্ছে কি যে আমি মদ খেয়েছি? সত্যি বলছি, আমার গায়ের রক্তে কে যেন এত বোতল মদ মিশিয়ে দিয়েছে, মাথার মধ্যে পাগলের দল উগ্র নেশায় ক্ষেপে উঠছে। আচ্ছা, আমাকে রক্ষা করবার কোনো উপায় কি আপনার জানা নেই?

সুলতা বল্‌ল—কি বলছেন আপনি?

কণ্ঠ বোধ করি উপেনের রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। বল্‌ল—কি বলছি? —বলে' একটা ঢোক গিলে সে পুনরায় বল্‌ল—বল্‌ছি যে ঘুমে আপনার চোখ ঢুলে এসেছে, আপনি শুয়ে পড়ুন,—আমি যাই বাইরে গিয়ে একপাশে পড়ে' থাকি, তারপর সকাল হলে—

সুলতা বল্‌ল—পোকা-মাকড় যদি কিছু কামড়ায়, তা ছাড়া শেয়াল-কুকুর—

উপেন একটু হাসল। হেসে বল্‌ল—পোকা-মাকড় কামড়াচ্ছে বলেই ত বাইরে যেতে চাইছি।

সুলতা বল্‌ল—ভেতরে শুলে কি আপনার ঘুম হবে না?

না, কিছুতেই না। ভেতরে না, বাইরে না—মাঠে ঘাটে কোথাও গিয়ে আজ আমার ঘুম হবে না। সবাই মিলে আজ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আমার সুখ নিয়েছে, শান্তি নিয়েছে,—আজ কোথাও আমার পালাবার পথ থাকলে আপনাকে একা এখানে ফেলে চলে' যেতাম।

পাগলের উন্মত্ত প্রলাপের মত উপেন বলে' চল্‌ল—এই রাত, এই বনজঙ্গল, এই দিশেহারা পথ ঝিঁঝিঁর ডাক, গাছের শব্দ, কুকুরের কান্না—সমস্তগুলো মিলেমিশে আজ আমাকে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করছে,—আমি বন্দী,—মুক্তির নিশ্বাস নেবার স্থান আর কোথাও রইল না!

ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে সুলতা বল্‌ল—আপনি আশ্চর্য্য!

মিথ্যে কথা! বিস্ময়ের কিছু নেই আমার মধ্যে। নিতান্ত—নিতান্ত সাধারণ মানুষ আমি। সামান্য একটা রাতের জন্যেও নিজের ভেতরকার জন্তু-জানোয়ারগুলোকে বশে রাখতে পাচ্ছিনে? আপনাকে সঙ্গে আনার দায়ীত্ব, আপনাকে সাহায্য করবার কথাটা একদম ভুলতে বসলাম?—ওকি, না—অমন ক'রে আমার দিকে চাইবেন না! নিজেকে অপমান করে এসেছি চিরকাল, কিন্তু ঘৃণা যেন আর না করতে হয়। অমন করে মুখের দিকে তাকালে আমি সব ভুলে যাবো!

উপেন উঠে বাইরে চ'লে গেল। ঘোরা অমা নিশীথিনী একটি ভয়াবহ রূপ নিয়ে তার কাছে আজ দেখা দিল। দেহ তার উত্তেজনায় একেবারে অবশ হয়ে এসেছিল, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে রোয়াকের ধারে মাথা কাৎ

করে' সে বসে' রইল। অসংযত নিঃশ্বাসের বেগে তার চওড়া বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল।

ঘুম কিন্তু তার চোখে আর এলো না। অনেকক্ষণ স্তিমিত দৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে সে আবার উঠে দাঁড়াল। তাকে যেন ভূতে পেয়েছে!

আবার এসে ঘরে ঢুক্‌লো। সুলতা তখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিদ্রিত নারীর দেহের দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর এদিক ওদিক একবার ঘুরে একটি ভাঙ্গা শ্লেটের টুক্‌রো কুড়িয়ে এনে তাই দিয়ে সুলতার অঙ্গ স্পর্শ করে' ডাকল—শুন্‌চ? ওঠো সুলতা, লক্ষ্মটি—শুন্‌চ?

সুলতা চোখ খুলে তাকালো। তার নিদ্রাজড়িত বিস্মিত দৃষ্টি দেখে মনে হল, সে যেন তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থাই ভুলে গেছে। চুপি চুপি অস্ফুট কণ্ঠে বল্‌ল—আপনি? কেন? কি বলছেন?

কম্পিত কণ্ঠে উপেন বল্‌ল—তুমি ঘুমিও না, সমস্ত দেহটাকে ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হয়ে অমন করে' ঘুমিও না সুলতা! ভূমিকম্পে সমস্ত এখনি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে—তারপর চুপি চুপি পুনরায় বল্‌ল—জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কাছাকাছি বোধ হয় সমুদ্র আছে, ঢেউ আছড়াচ্ছে! শুন্‌চ না?

ঢেউ? সত্যি?—ভয়ে সুলতা আর উঠতেই পারল না!

ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে উপেন বল্‌ল—বোধ হয় বান আসছে, সব এবার হয়ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কি হবে সুলতা?

সুলতা এবার উঠে বস্‌ল।

উপেন পুনরায় বল্‌ল—ধর্ম্মের আলো গেল চোখ থেকে মুছে, নীতির বাঁধন গেল, সংস্কারের বেড়া গেল ভেঙে! ইহকাল-পরকাল কিছুই আর রইল না সুলতা। কিন্তু তুমিই বল, এতগুলো বস্তুকে ধ্বংশ করবার

শক্তি যার আছে সেটা কি কিছুই নয় ? মানুষের জীবনে তার কি কোনো মূল্যই নেই ?

কী সে উপেনবাবু ?

কি ? সে প্রেম নয়, আকর্ষণ নয়, স্নেহ মমতা নয়—সুলতা সে যে কী এ আমি আজ আর বোঝাতে পারব না। সে আনে ঝঞ্ঝা, সমস্ত ওলোটপালট করে' দেয় ! প্লাবন আনে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বলে'। পাপের মনোহর মূর্ত্তি আনে, মুগ্ধ করে' দেয় ! প্রলোভন আনে তাকে রাজবেশ পরিয়ে !—বলতে বলতে সুলতার একখানি হাত চেপে ধরে উপেন পুনরায় বল্‌ল—যে বস্তু সমস্ত ভুলিয়ে দেয় তাকে তুচ্ছ করব আমরা কোন্ স্পর্দ্ধায় ? সুলতা সেটা কি এতবড় মিথ্যে ?

এই কথা একদিন সত্যেনও শুনিয়েছিল। হঠাৎ সুলতার মনে হল তার মৃত স্বামীর ছায়া উপেনের আবেগ-উচ্ছ্বসিত, উজ্জ্বল মুখখানার ওপর এসে পড়েছে ! সুলতা হাঁ করে' তাকিয়ে রইল !

উপেন হাত সরিয়ে নিল। তারপর নিঃশব্দে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। পরে ধীরে ধীরে বল্‌ল—এমন যে কেন হয় বুঝতে পারিনি। অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক অপমান, অনেকের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছি—কি পেলাম তাতে ? আনন্দ ? ছাই ! এই একটি মাত্র দুর্ব্বলতা, এ জন্যে বন্ধু-সমাজে আমার অপবাদের আর অন্ত নেই !

সুলতা বল্‌ল—তারা আপনাকে বুঝতে পারে না !

পারে না ? তা হবে। আমার যথার্থ যেটুকু সদ্‌গুণ, যেটুকু উদারতা, মহত্ব, তা তাদের চোখে পড়ে না, আমার আনন্দ-বেদনাকে পর্য্যন্ত তারা এই লালসার নিক্তিতে ওজন করে দেখে। সুলতা, বিধাতা বলে' কেউ থাকলে বলতাম, মানুষকে এই পাশব প্রবৃত্তি দিয়ে তুমি স্বার্থপরতাই প্রচার করেছ ! মানুষ পাছে স্বর্গরাজ্য গোড়ে তোলে এজন্যে তোমার ঈর্ষার আর শেষ নেই !

অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে উপেন আবার বল্‌ল—সুলতা, তুমি এমনিই,—কেউ যদি তোমার কাছে আসে তুমি তার চোখে কাজল বুলিয়ে দাও, তাকে নেশা দাও, তার জীবনকে অকর্ম্মণ্য করে তোলো! তোমায় দেখলে লোকের বিকার আসে, পাগ্‌লামি আসে, খেয়াল আসে! তোমার সঙ্গে মিশ্‌লে গাছের রঙ্‌ হয় সবুজ, আকাশ হয় রাঙা, মাটী হয় নরম! তুমি কেবলই পথ ভোলাতে পারো সুলতা!

আলোটা টিপ্‌ টিপ্‌ করে এতক্ষণ জ্বল্‌ছিল। হঠাৎ বাইরে মেঘের ডাক শোনা গেল।

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে উপেন বল্‌ল—কি ও?

বোধ হয় মেঘ করেছে!—সুলতা বল্‌ল।

মেঘ? হাওয়া উঠ্‌ল নাকি?—বলে উপেন উঠে বাইরে এল। আকাশের একদিকটা তখন লাল হয়ে উঠেছে। দূরে কোন পাহাড়ের চূড়ায় যেন আগুন লেগেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গগনের সর্ব্বপ্রান্ত উত্তাল মেঘের জটলায় ঘোরালো হয়ে এল। দেখতে দেখতে মাটীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে' বড় মড় গাছগুলি মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ছটপট্‌ ক'রে উঠল। বিদ্যুতের প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ শরাঘাতে অন্ধকার রাত্রি ক্ষতবিক্ষত হতে লাগ্‌ল। ধূলো-বালি পাতা লতা চারিদিকে উড়িয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে বাতাস ধেয়ে' চল্‌ল।

জান্‌লা দরজার ভাঙা পাল্লাগুলি ঝপাৎ ঝপাৎ করে' সশব্দে বুক চাপ্‌ড়াতে সুরু করল। দূরে কোথায় একটা বাজ পড়ার শব্দ হল।

উপেন বাইরে থেকে ঘুরে আবার এসে দাঁড়াল। ঝড়ের দেবতার উদ্দাম জটাজালের দিকে তাকিয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সুলতা অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—পুরোণো বাড়ী, যদি সইতে না পারে সুলতা?

—চুপ করুন,—সুলতার গলা কেঁপে উঠ্‌ল—ও কথা বলবেন না, আমি কি এখানে একলা আছি উপেনবাবু?

অসংখ্য রোগী-মুমুর্ষুর আর্ত্তনাদের মত ঝড়ের গোঙানি কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ দেয়াল থেকে একটা বালির চাপ্‌ড়া মাটীতে খসে' পড়ে' গুঁড়িয়ে গেল।

ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে উপেন সেই দিকে একবার তাকালো। তারপর এগিয়ে এসে সুলতার একখানি হাত ধরে' বল্‌ল—আমিও একা নেই এসো।

দরজার বাইরে এসে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার দিকে ক্ষণেকের জন্য একবার তাকিয়ে সুলতা আরেকটি হাত দিয়ে উপেনের অন্য হাতখানা চেপে ধরে বল্‌ল—কোথা যাবেন এ দুর্য্যোগে? যদি বিপদ ঘটে আপনার?

উপেন বল্‌ল—আর যদি ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ে? তোমার জীবনের দায়ীত্ব নিয়েছি এ-কথা ভুল্‌বো কেমন ক'রে সুলতা?

ঝড়ের গর্জ্জনের নীচে তারা দুজনে পথে নাম্‌ল। কিন্তু কোথা পথ, কোন্ দিকেই বা-আলো? গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রাশি রাশি ধুলো উড়ছে, চোখ খুলে স্পষ্ট ক'রে তাকাবার উপায় নেই! বাতাসের বেগে তারা মাঝে মাঝে টলে' পড়তে লাগ্‌ল, আবার টাল্ সাম্‌লে এগিয়ে চল্‌লো। দুজনে দু'জনকে শক্ত ক'রে ধরে' পথ হাঁতড়াচ্ছে, ধুলোবালির জন্য চোখ বন্ধ করা ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। কয়েক পা এসে তারা একটা গাছের কাছে দাঁড়ালো, গাছটি কিন্তু তখন হাত পা ছুড়ে ছট্‌ফট্ করছে। ভেঙে মাথায় পড়বার আশঙ্কায় উপেন আবার সুলতার হাত ধরে' টেনে নিয়ে চললো।

এক এক পা ক'রে তারা অতি সাবধানে চল্‌ছে। নাকে, মুখে, জামা-কাপড়ের মধ্যে তাদের কাঁকর বিঁধ্‌ছে। মহাকালের মালা

থেকে আজকের অস্বাভাবিক রাত্রিটি যেন খসে' পড়েছে, এ রাত্রি তাদের পরমায়ুর মধ্যে গণ্য হবে না।

—কোন্ দিকে চলেছি বল ত' সুলতা ?

গভীরতম অন্তর থেকে অপূর্ব্ব কোমল কণ্ঠে সুলতা বল্‌ল—তাত জানিনে ?

ফিরে যাবেন ত' এলেন কেন ? এই বেশ লাগ্‌ছে।

হঠাৎ বাতাসের একটা ধাক্কায় পায়ে পায়ে জড়িয়ে তারা ঘুরে পড়েছিল আর কি ? আবার সোজা হয়ে তারা এগোতে লাগ্‌ল। উপেন বল্‌ল—সুলতা, ভালবাসার সম্মান বুঝি কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্মান, একটি মেয়েকে যদি আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করা যায় ? আমি খুব বড় দুশ্চরিত্র সুলতা, কিন্তু মেয়েদের মন আমি জানি, যুগে যুগে তারা 'বড় দুশ্চরিত্রকেই সম্মান দিয়ে এসেছে ! আমি যেদিন তোমার চোখের সুমুখ থেকে সরে যাবো, সেদিন আমার ছবিই তোমার আকাশ জুড়ে থাকবে !

তারা মাঠের ধারে এসে পড়েছিল। হাওয়ার বেগ থামেনি কিন্তু ধুলো-কাঁকর আর তাদের মুখে ফুট্‌ছে না। দু'জনে চোখ খুলে তাকালো। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছিল না। উপেন বল্‌ল—এইখানেই দাঁড়াই, রাত পুইয়ে যাক্।

সুলতা বল্‌ল—আগে ঝড় থাম্‌বে, কি আগে রাত পোয়াবে ?

উপেন বল্‌ল—ঝড়ের রাতে ঝড়ই আগে থামে। চিরদিন ঝড়ের পরই রাত পোয়ায় সুলতা। এসো, এইখানে বসি একটু, হাওয়ার বেগে দাঁড়ানো যায় না,—মাথাটা ধরে গেছে !

সুলতা বসলো তার পাশেই। তার কাঁধের ওপর একটি হাত তুলে দিয়ে উপেন বল্‌ল—আচ্ছা, তোমার কি কেবল এই কথাই মনে হচ্ছে, সে নিজের নাগালের মধ্যে পেয়ে আমি তোমার ওপর শুধু সুবিধেই নিচ্ছি ?

সুলতা বল্‌ল—এ-কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন ?

উপেন বল্‌ল—আমার মন তোমার মধ্যেই এক-একবার ডুব দিচ্ছে। তবু জানি আমি তত বড় কাপুরুষ নই যে, বন্ধু-স্ত্রীকে পৌছে দিতে এনে অবৈধ সম্বন্ধ পাতিয়ে পালাবো। সমস্ত কাজের মধ্যেই আমি সজাগ থাকতে চাই। আচ্ছা, আমি যদি তোমার জীবনে একবার ছায়াপাত ক'রে যাই, তা হলে কি সেটা এত বড় অন্যায় ?

সুলতা বল্‌ল—অন্যায় কি উপেনবাবু, যার কাছে এলাম তাকে ভালবাসবো, এর মধ্যে ত'—

উপেন তার কাঁধের ওপর মাথা রাখল। তারপর ধরা গলায় বল্‌ল—সুলতা, এই মুহূর্ত্তের মূল্য দুনিয়ায় কেউ দেবে না। কাল সকালে রোদের আলোয় এই মুহূর্ত্তটির দিকে তাকিয়ে নিজেই হয়ত ছি ছি করবো, তবুও এ সত্যি, মৃত্যুর পরে গিয়েও মনে পড়বে, এ-জীবনের একটি নিমেষ আমি গ্লানিমুক্ত হয়েছিলাম।

সুলতা তার গালের ওপর গাল রেখে চুপ ক'রে রইল। চোখের কোন্ বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা পড়ল উপেনের মুখের ওপর। অবরুদ্ধ কণ্ঠে উপেন বলল—সুলতা, একে যদি কেউ কদর্য্য প্রণয়াসক্তি বলে তবে সে অবিচার আমরা সইবো না! আমরা দুই সমুদ্র থেকে উঠে এসেছি, আজ আমাদের প্রথম দেখাশোনা! এই করুণ ভালবাসার মুহূর্ত্তটি মহাকালের গলায় রত্নমণির মত দুল্‌বে, সুলতা।

আকাশ একটু একটু স্বচ্ছ হয়ে এল! চারিদিকের দিগন্ত-অঙ্গনের ওপর দাপাদাপি ক'রে ঝড় থেমে গেছে। আকাশ এবার শান্ত, ধ্যানরত মহাদেবের চক্ষুর মত নিবিড়। রাত শেষ হয়েছে!

দু' জনে মুখ তুলে দুজনের দিকে তাকালো। সহজে কেউ কাউকে চিন্‌তে পারল না, ঝড় খেয়ে দুর্য্যোগের রাতে পথে নেমে চেহারা তাদের বদ্‌লে গেছে। ধূলোয়, বালিতে ও চোখের জলে একত্রে মিশে দু'জনের মুখেই কাদা মাখামাখি।

দু'জনেই হাস্‌ল।—একি চেহারা হয়েছে আমাদের ? চলুন এবার ঘরে যাই।

উপেন বলল—ওই ত ইস্কুল-ঘর, আমরা তা হলে অত যুদ্ধ ক'রে এইটুকু এসেছিলাম ?—তা হলে কি করবে ? কাশীতে তোমার মামার কাছেই যাবে ?

তা ছাড়া ত আর জায়গা নেই!

তাই চল।—একটি নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে উপেন বল্‌লে—কিন্তু আর নয় সুলতা, প্রলোভনের পাশে থেকে সংযম করার মত মহৎ ভণ্ডামী আমার নেই। কাশীতে তোমাকে পৌঁছে দিয়েই আমি চ'লে যাবো।

দুজনে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই উপেন বল্‌ল—আর একটুও দেরী নয়, চাদর দুখানা ঘরে পড়ে আছে, নিয়েই চলে এসো।

সে কি মাষ্টার মশাইকে না বলে'—

হ্যাঁ, তার আগেই পালাবো। লোকজন জেগে উঠে শহুরে মানুষকে ভিড় করে দেখতে এলেই বিপদ। বিধবাকে নিয়ে একঘরে রাত্রিবাস করেছি, তার ওপর এই চেহারা হয়েছে, যাবার সময় এ আর গাঁয়ের লোককে দেখিয়ে কাজ নেই! তোমার মাথায় সিঁন্দুর নেই মনে আছে ত?

সুলতা হেসে বল্‌ল—লুকিয়ে চলে গেলেই কি বুঝবে না ?

স্ত্রী বলে' তোমায় জেনেছে, তাতে বিশেষ দোষ হবে না! স্ত্রীর সঙ্গে জঘন্য কুৎসিত আচার ওরা সইবে, কিন্তু বিধবার সঙ্গে গীতা অধ্যয়নও ওদের অসহ্য।

সুলতা গিয়ে চাদর দুখানি নিয়ে বেরিয়ে এল। ভোর হতে তখন আর দেরী নেই।

সকাল বেলা গাঁয়ের লোকেরা জেগে ওঠবার আগেই তারা অনেক দূর পথ অতিক্রম ক'রে চ'লে গেল।

আট

পশ্চিমের গাড়ীর কোনো একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরার একটি কোনে দুটি ঘরছাড়া নরনারী এতক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে বসেছিলো। সমস্তদিন অনাহারে এবং পথশ্রান্তির মধ্যেই কেটে গেছে। দুজনেরই মাথার চুল এলোমেলো, রুক্ষ, তৈলহীন। পরণের কাপড়-চোপড়গুলি ময়লা, ধুলো মাথা,—গাড়িতে কোথায় খোঁচ লেগে ছিঁড়েও গেছে। রোদের তাতে সমস্ত দিনটা গাড়ীর মধ্যে গরমে ভারি কষ্টেই কাট্‌ল।

ট্রেণ চল্‌ছে। লোকজনের ভিড় বিশেষ নেই। জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে সুলতা বেঞ্চের ওপর পা গুটিয়ে বসেছিল, উপেন তারই একটা পায়ের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ থেকে অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে!

সন্ধ্যা কখন্ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; দুধারে মাঠ, বন-জঙ্গল, গ্রাম সমস্তই অন্ধকার! বাতাসের উষ্ণতা এখনও সম্পূর্ণ যায়নি। মুখে চোখে এখনও গরমের আঁচ্ লাগে।

সুলতা ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভিতরের দিকে তাকালো। উপেনের গলার গরদের চাদরটা এতক্ষণ মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল, সুলতা সেখানা তুলে গুটিয়ে নিজের কোলের মধ্যে রাখতেই নাড়াচাড়া পেয়ে উপেনের ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে উঠে বসে' সে বল্‌ল—বৌদি?

সুলতা এবার ছেলেমানুষের মত না হেসে থাকতে পারল না। বল্‌ল—বৌদি? কত রকম করে আমাকে ডাকবেন বলুন ত?

উপেন চোখ রগ্‌ড়ে বল্‌ল—কাঠের ওপর মাথা রেখে চমৎকার যাতনার মধ্যে ঘুমিয়েছিলাম, তোমার কোলের মধ্যে মাথা গেল কি করে।

ঘুমের ঘোরে তুলে' নিয়েছিলাম !

তা জানি, ঘুমের ভান করে' নিজের মাথা কখনই তোমার কোলের ওপর তুলে দেব না ! কিন্তু কেন শুনি ? যত্ন, না মমতা ?

স্থলতা থতিয়ে গিয়ে বল্‌ল—অন্যায় হয়েছে ?

উপেন এবার তার মুখের দিকে তাকালো ; বল্‌ল—অন্যায় ?

—বলে সে হাসল। হেসে বল্‌ল—জীবনে অন্যায় তুমি এতটুকু করনি ! কিন্তু যাক্ গে ওসব কথা ; ঝড়ের মত্ততাকে আমি একদম ভুলেই গেছি বৌদি ! এবার একটুখানি মধুর মিথ্যাচার করে' নিজেকে রসিয়ে নেবো। ইস্—তোমার যে অবস্থাটি হয়েছে সুলতা, তোমার দিকে তাকালে আমার মত প্রবীণ পুরুষের মুখও মেয়েদের মত লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। তোমাকে সাম্‌লে নিয়ে যাচ্ছি বলে' কি তোমার পরণের কাপড়-চোপড়গুলোকেও সাম্‌লাতে হবে নাকি ?

দুজনের মনই কেন জানি না, আজ সমস্তদিনই বেশ হাল্‌কা হয়ে রয়েছে। সুলতা হেসে বল্‌ল—আর আপনার ওগুলো বুঝি খুব চক্‌চকে আছে ?

দুটো হাত নেড়ে উপেন বল্‌ল—সুবিধে আছে, বুঝলে ভদ্রমহিলা ? আমরা যে পুরুষ, নিন্দে করবার কেউ নেই !

এমনি কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ কাটবার পর উপেন বল্‌ল—দিদি কিন্তু না-থেকে আমাদের খুব ভোগালেন যা হোক ! ভোর রাতে ইস্কুল-ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মাঠ পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে ইষ্টিশানে পালানো অনেকদিন মনে থাকবে ! আচ্ছা, মাষ্টার মশাইয়ের মুখখানা মনে পড়ছে কি ?

সুলতা বল্‌ল—মানুষটি ভারি শান্ত !

উপেন বল্‌ল—ওপরটা ! পাড়াগাঁয়ের অভিজ্ঞতা আমার কিছু

কিছু আছে! ওই মানুষ যখন সকাল বেলায় উঠে দেখত যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই—তুমি বিধবা—তখনই ভোজবাজীর মত তাঁর মুখের চেহারা যেত বদলে! সামান্য অতিথি-সৎকারের জন্যে সমস্ত জীবন ধরে' তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো!

সুলতা চুপ করে' রইল।

উপেন খানিকক্ষণ পরে বল্‌ল—এবার ত' তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে! তোমার দিন সেখানে কাট্‌বে কেমন করে' সুলতা?—থাক্, সে উত্তরও আমি আর শুন্‌তে চাইনে। আমি তোমায় ভালবাসলে না-হয় এর উত্তর পাবার অধিকার আমার থাকত!

সুলতার চোখ দুটি ভারি হয়ে এসেছিল। মাথা নীচু ক'রে সে বল্‌ল—আপনি ত আমাকে ভালই বাসেন।

উপেন হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো! বল্‌ল—রাতের বেলা গাড়ীর মধ্যে বসে' স্পষ্টাক্ষরে তুমি একথা বলতে পারলে?

সুলতা বল্‌ল—একথা লুকিয়ে কি হবে?

তা বটে!

উপেন বল্‌ল—ভালবাসার পরিচয়ই বোধ হয় বরাবর আমি দিয়ে এসেছি! স্বামীর জীবিতাবস্থায় গোপনে স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করা, পরস্ত্রীর রূপের প্রশংসা, নিজেকে অর্থশালী করে' সুন্দর ক'রে মনোহর করে' দেখানো, নিঃস্বার্থ সাহায্যের আতিশয্য দেখিয়ে প্রবলভাবে আকর্ষণ করা, তারপর আমাদের কালকের ঘটনাটা—সুলতা, ভালবাসার এই পরিচয়ই বোধ হয় এখন দুনিয়াতে চল্‌ছে!

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে' দ্রুতগতিতে গাড়ী ছুটে চলেছে। মাঝপথে কোন্ ষ্টেশন থেকে গুটিকয়েক লোক ইতিমধ্যে গাড়ীতে উঠেছিল!

উপেন বল্‌ল—আশ্চর্য্য, নিজের চরিত্রের অলি-গলি সমস্ত জানি সুলতা, কিন্তু হৃদয়টাকে আজ অবধি খুঁজে পেলাম না! সে যে কোথায়,

সে যে কি চেয়ে কি পায়নি, তা বুঝতেই পারলাম না! তার না-আছে কোন ঠিক, না কোনো ঠিকানা! সকলের চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য থেকে সকলের চেয়ে বেশী বঞ্চিত রইলাম! বলতে পারো সুলতা, মানুষ কেমন করে' ভালবাসে?

সুলতা ধীরে ধীরে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে করুণকণ্ঠে বল্‌ল—আপনি অমন করবেন না উপেনবাবু, ও আমি সইতে পারি না।

আস্তে আস্তে উপেন হাতটা আবার টেনে নিল। তারপর বল্‌ল—দুঃখ? দুঃখ আমার নেই! মুক্ত জীবন,—অবাধ; মাথার ওপর কেউ কিছু বলবার নেই, যেখানে যখন ইচ্ছা যেতে পারি, খাওয়া পরার ভাবনা তিন পুরুষেও ভাবতে হবে না, মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করবারও যথেষ্ট সুবিধা আছে, অসচ্চরিত্র হয়ে জীবনটাকে একেবারে উড়িয়ে দিলেও কেউ বাধা দেবে না—কিন্তু সুলতা, ক্ষুধা কি তাইতেই মিট্‌বে? খাওয়া পরার দুঃখ না থাকা মানে কি কোনো দুঃখই নেই?

সুলতা বল্‌ল—আপনি আরো একদিন বলেছিলেন একথা!

উপেন বল্‌ল—এই আমার কথা, আর কিছুই আমার নেই! এই কথা নিয়েই আমার দিন যায়, রাত যায়,—এই কথা নিয়েই আমার পথে পথে কাটে! কি আমার করবার আছে, কি আমি চাই, কি জন্যে এলাম—এই কথাই আমার সমস্ত জীবনকে অন্ধকার ক'রে রেখেছে সুলতা!

প্রায় সমস্ত রাত এমনি করেই কেটে গেল। গাড়ী যখন ইষ্টিশানে এসে দাঁড়াল তখন চারটে বাজে!

কুলির মাথায় বাক্সটা দিয়ে দুজনে প্ল্যাটফর্ম্‌টা পার হয়ে এসে 'ওয়েটিং রুমে' ঢুক্‌লো। ভেতরে লোকজন কেউ ছিল না, যে জমাদারটা আড় হয়ে মেঝের ওপর পড়েছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেল।

দুজনে দুটো বেঞ্চি দখল ক'রে বস্‌ল। উপেন জল আন্‌ল। এনে বল্‌ল—মুখ ধোয়া যেতে পারে কিন্তু এখন খাবার দাবার আর কিছুই পাওয়া যাবে না। বাড়ী পৌঁছেই যা হোক করা যাবে। মামার ওখানকার ঠিকানা মনে আছে ত?

সুলতা বল ল—আছে! দেবনাথপুরায় ওঁদের বাড়ী।

মুখে চোখে জল দিয়ে বাক্স খুলে সুলতা দুজনের ফর্সা কাপড় বার করল।

উপেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। বল্‌ল—স্বামী স্ত্রী না হলে পথে অনেক বিপদ ঘটে দেখছি। কাপড় নিয়ে আপনি যান্ 'বাথরুমে' আমি এখানেই কাপড় ছাড়ি! মেয়েদের পরিচ্ছদ বদ্‌লানোর মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে কি না!

সুলতা বল্‌ল—আপনার মুখের কোনো আগল নেই।—বলে সে চলে গেল।

কলের ঘর থেকে সে আবার যখন বেরিয়ে এল, তখন, প্রস্ফুটিত পদ্মের মত তার এক রাশ রূপ সমস্ত ঘরখানায় ছড়িয়ে পড়ল।

উপেন একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। নিষ্কলুষ স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলে উঠ্‌ল—বৌদি, তোমার পায়ে ধরি, 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার!'—এ যে দেখছি আমারই দেওয়া সেই বসুন্তি রঙের সাড়িখানি! বৈষ্ণবকবি কেউ এখানে থাকলে বলতেন, তোমার সর্ব্বাঙ্গ জড়ায়ে শুধু আমিই আছি!

মনে হল সুলতার সকল মন, সকল অঙ্গ একটি স্নিগ্ধ দীপ্তিতে ভরে উঠেছে! উপেন বল্‌ল—কিছু মনে করো না সুলতা দেবী। বন্ধু-স্ত্রীর দেহের ওপর যখন টান্ ছিল, তখন তার রূপ এমন করে' আর চোখে পড়েনি। আমার এক বন্ধু সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে কেন যে আবেগে চোখের জল ফেল্‌তো তা এখন বুঝতে পাচ্ছি। তোমারও

সেই রূপ—যে-রূপ প্রশংসায় বলা যায় না, বর্ণনায় বোঝানো যায় না! আর সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে রূপের প্রশংসা শুন্‌লে তোমার আত্মপ্রসাদ আসে না!

সুলতা স্মিতমুখে তাকিয়ে ছিল। উপেনের মেধা, তার গুণগরিমা, চিন্তাশীলতা এবং আত্মপ্রকাশের সহজ শক্তি,—মনে মনে সুলতা তার তুলনাই খুঁজে পায় না। এই মানুষটিকে মনে মনে সে অন্তত সহস্রবার প্রণাম করেছে।

উপেন একবার বাইরে গিয়ে ঘুরে এল। এসে বল্‌ল—ভোরের আলো ফুট্‌ছে বাইরে, দুজনে মিলে আজ সূর্য্যোদয় দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে সুলতা!

সুলতা উঠে বাইরে এল। আকাশের একটা দিক তখন বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। ভোরের ছোট ছোট বিষণ্ণ মেঘগুলির গায়ে অল্প অল্প লালের আভাস লাগছিল। দূরের গাছগুলি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল।

পাশে দাঁড়িয়ে উপেন বল্‌ল—আমার জীবনে কোনদিন সূর্য্যোদয় হয়নি সুলতা!

দিঘীর জলের ওপর ঢিল্‌ পড়লে যেমন করে' কাঁপতে থাকে, সুলতার মনের ভেতরটা তেমনি করেই কাঁপতে লাগল। বল্‌ল—আমারো হয়নি উপেনবাবু!

তোমারও না? স্বামী পেয়েছিলে, ঐশ্বর্য্য পেয়েছিলে, ভালবাসা পেয়েছিলে, আনন্দ পেয়েছিলে—জীবনের দিনমানটা সমস্তই তুমি ত' ভোগ করে' নিয়েছ! তবুও দুঃখ বলে' তোমার একটা কিছু সম্বলও আছে, কিন্তু আমার—চল আর নয়, এবার রোদ উঠেছে।—একটু হেসে উপেন বল্‌ল—আমার বক্তৃতার ভাঁড়ারটি তোমার পাল্লায় পড়ে' এবার বুঝি খালি হয়ে গেল!

কুলিটা এতক্ষণ কোথায় অপেক্ষা করছিল—এবার এসে বাক্সটা মাথায় তুলে নিল।

গেট্-এর কাছে আসতেই সুলতাকে দেখে টিকিট্-কালেক্টর্ পথ ছেড়ে সরে' দাঁড়াল—টিকিট সে আর নিলই না!

* * *

ধূলা-ধূসরিত পশ্চিমের সহরের পথ। সকাল বেলায় স্ত্রী-পুরুষ ঝাড়ুদারের জটলা সুরু হয়ে গেছে। পথে পথে দোকান-পসার খুলেছে। মন্দিরে মন্দিরে সানাইয়ের আলাপ চলেছে। নানান্ জাতের মেয়ে-পুরুষ মাঝে মাঝে দল বেঁধে 'রামনাম' করতে করতে প্রাতঃস্নানে বেরিয়েছে। শাঁক, ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দে চারিদিক মুখর। ধুপ-ধুনোয়, ফুলে-পাতায়, চন্দন-গন্ধে বাতাসটি ভর ভর করছে। একটি স্নিগ্ধ স্বাত্ত্বিকতার মাধুর্য্যে সবাই যেন পবিত্র হয়ে উঠেছে।

যেন একটি নবদিবসের জন্ম হল!

অনেক রাস্তা, অনেক আঁকা বাঁকা গলিঘুঁজি পার হয়ে, উঁচু নীচু নানা জাতের পথ অতিক্রম করে' দেবনাথপুরার এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একখানি বাড়ীর নীচে দুজনে এসে দাঁড়াল।

সুলতা বল্‌ল—কড়া নেড়ে ডাকুন?

উপেন থতমত খেয়ে বল্‌ল—তাত' ডাকবো, কিন্তু আমি—আমি কিন্তু কি বলে' পরিচয় দেবো?

বলব আমার স্বামীর বন্ধু!

দাঁড়াও—সুলতার হাত ধরে' উপেন থামিয়ে দিয়ে পুনরায় বল্‌ল—যদি তোমার মামা সে কথা না বুঝতে পারেন?

ভয় কি!—বলে' সুলতা দরজার কড়া নাড়ল।

বার তিনেক কড়া নাড়বার পর ভেতর থেকে দরজা খুলে' গেল। মুখ বাড়িয়ে এক বৃদ্ধা বল্‌ল—কে গা বাছা তোমরা?

সুলতা বল্‌ল—ক্ষিতীশবাবুর বাড়ী ত? তিনি আমার মামা।

বটে? এসো মা এসো। জামাই বুঝি পেছনে?—ওমা না, এ কে—আহা এতটুকু মেয়ের কপাল পুড়লে কি আর সহজে চেনা যায় মা? তুমি তবে কে বাবা?

সুলতা বল্‌ল—উনি আমার দেওর বুড়ি মা!

ও, তাই নাকি, এসো ভাই এস, যাও ওপরে, তোমাদেরই ত সব মা, আমি দো'র আগ্‌লে পড়ে থাকি বৈত' নয়। যাও ভাই তোমার বৌদিদির সঙ্গে ওপরে!—আর বাছা, তিন টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে কি আর ভাল ঘর পাওয়া যায়? ক্ষিতীশবাবুকে বলে' কত সাধ্য-সাধনা ক'রে তবে—

ছুজনে ওপরে উঠে গেল। বাক্সটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে উপেন বল্‌ল—কই তাঁরা?

সুলতা বল্‌ল—বুড়ি মা, মামারা কই?

নীচে থেকে বুড়ি বল্‌ল—আর মা, ক্ষিতীশ এখানে থাকলে আর ভাবনা কি! দিনাজপুর ছেড়ে তার কোথাও থাকবার যো নেই। মামী আছেন, আর বড় ছেলে। ছেলের এই ত গেল মাসে বে' হল!

কই তাঁরা?

বুড়ি বল্‌ল—জানো না? পেরাগে গেছে যে! আসবে আবার শিগ্‌গিরই!

সুলতা ঠায়ে সেখানে দাঁড়ায়ে রইল। উপেন বল্‌ল—তাই ত, 'অভাগা যেদিকে চায়…' যাক্ ছ'চারদিনের মধ্যে এলেই হল! আপনি ত আর জলে পড়লেন না! কিন্তু ভালো কথা, আপনি এবার কিঞ্চিৎ আহারের ব্যবস্থা করুন দেখি? বাঙালীর ছেলে, অন্নগত প্রাণ, ভাত ছুটি খাই আর নড়ে' চড়ে' বেড়াই।

বুড়ির সঙ্গে সহযোগ ক'রে সুলতা রান্নাবান্নার ব্যবস্থায় মন দিল। পয়সা হাতে পেয়ে বুড়ি বাজারে গিয়ে কেনা-কাটা ক'রে নিয়ে এল।

নিজের ঘরের শিল্-নোড়ায় বাট্না বেটে দিল, কুট্নো কুটে আন্লো। বুড়ি আজ চল্লিশ বছর কাশীবাস করছে!

বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় স্নানাহার সেরে উঠে দুজনে এসে বসল।

উপেন বল্ল—তারপর?

সুলতা বল্ল—পেট ভরেছে আপনার?

একটু হেসে উপেন বল্ল—কেন, হাঁড়িতে তোমার আরো কিছু আছে নাকি?

না থাকলেও আবার তৈরী করে' দিতে পারি।—সুলতা বল্ল।

উপেন বল্ল—থাক্ বৌদি, এখনকার মত সত্যিই পেট ভরেছে। ক্ষিধে পেলে আবার কোনো সময় এসে খেয়ে যাবো—কেমন?

কবে আবার আসবেন বলুন?

উপেন এবার হাসল। বল্ল—এত করে' খাইয়েও কি তোমার তৃপ্তি হল না?

সুলতা বল্ল—আমি এখানেই এখন থাকবো, এলে এখানে এসেই উঠবেন।

আবার যখন আসবো, তখন চিন্তে পেরে জায়গা দেবে ত?

সুলতা মাথা নীচু করে' ঘাড় নেড়ে জানালো, দেবে!—তা বলে এঁদের আসার আগেই যেন চলে যাবেন না!—আপনাকে এখন থাকতে হবে দিন দুই!

থাকতে হবে?—উপেন একটুখানি হেসে বল্ল—পরীক্ষায় পাশ করে' গেছি সুলতা,—তা বলে আর নয়! আমাকে যেতেই হবে এবং আজই যাবো।—তুমি ভাবচো বোধ হয় তোমার চলবে কেমন করে? কিন্তু চল্বেই। চিরকালই চলবে! সংসারে কারো জন্যে কারো আটকায় না!

সুলতা কথা বল্‌ল না।

নীচে বুড়ির গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। দেশ থেকে ভাইপো আজও মাসকাবারি টাকা পাঠায়নি—বুড়ি তাই গালাগালি দিয়ে ভূতছাড়া করছে।

সুলতা বল্‌ল—এবার গিয়ে আপনি কি করবেন?

কি করব! হয়ত অনেক কিছুই করব, কিম্বা কিছুই করব না! সমস্ত সকালই হয়ত আমার জান্‌লার ধারে' বসে মরা নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে থাক্‌বো, দুপুর বেলা রোদে রোদে টহল্‌ দিয়ে বেড়াবো, সন্ধ্যা বেলায় অন্ধকার ঘরে হয়ত মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে থাকব, আর রাতের বেলা? চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় কাঁকর ফুট্‌বে, আলো-নেবা ঘরের মধ্যে অশরীরি মানুষের ছায়ামূর্ত্তি দেখে ডরিয়ে উঠবো, বিধাতার নিন্দা করব, নিজেকে দেবো বারে বারে অভিশাপ! সুলতা, এত রকমেও কি চব্বিশটা ঘন্টা কেটে যাবে না?

বিদায় দিতে গিয়ে সুলতার চোখে এল জল!

উপেন একবার তার দিকে তাকালো, তারপর নিজের মনেই আবার বল্‌ল—সুলতা, আমাকে বেঁধে রাখবার অনেক বস্তুই তোমার হাতে ছিল। পদ্মপলাশের মত ছিল তোমার কালো চোখ, শ্রাবণের মেঘের মত ছিল তোমার চুল, দুধে আল্‌তার মত তোমার শ্রী, চাঁপার কলির মত তোমার হাত-পা'র আঙ্গুল,—সকল কালের মানুষ, সর্ব্বকালের দেবতা নারীদেহের যে ঐশ্বর্য্য নিয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে, তার চেয়েও বেশী আমি তোমার কাছে পেতাম! কিন্তু এবারের মত থাক্‌। তোমার দেহের কারাগার থেকে এবার আমি মুক্তি নিলাম! মনে করো না এ সংযম! ভেবো না যে আমার নীতিবোধ জেগে উঠেছে! এ হচ্ছে আমার নিজের প্রতি সহজ বিচার! সুলতা, পরের জন্মে চোখ দুটো যদি আনি, দৃষ্টিহীন হয়ে আসবো! যেন আসবার সময় সাংসারিক বিষয়-বুদ্ধি

নিয়ে আসি, বুকের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আত্মনাশী কামক্ষুধা থাকে, অজ্ঞতা যেন সে-জীবনকে চিরদিন অন্ধকার করে' রাখে,—হৃদয়বৃত্তিকে যেন একেবারে নির্ব্বাসন দিয়ে আসতে পারি!

বলতে বলতে উপেন উঠে দাঁড়িয়ে গলার আওয়াজটা পরিষ্কার করে' নিয়ে পুনরায় বল্‌ল—সময় আর নেই, ওঠো সুলতা। বেলা তিনটের গাড়ী!

সুলতা উঠে বাইরে এল। নীচে বুড়ি বোধ করি তখন দরজা বন্ধ করে' ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ির অনেক জ্বালা!

জিনিস-পত্র গুছোতে গুছোতে উপেন বল্‌ল—সুলতা আমাকে তুমি যে-চোখেই দেখ না কেন, তোমার সমস্ত কথার আড়ালে আমার কেবলই মনে হয়েছে সত্যেনকে তুমি সত্যিই ভালবাসতে! একি সত্যি নয়? বলত, হ্যাঁ কি না?

সুলতা ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ!

উপেন বল্‌ল—বেশ তা যেন হলো, কিন্তু—আচ্ছা বলত' আমার মুখের দিকে চেয়ে,—না না, ওকি—লজ্জা করলে চলবে না কিন্তু—আচ্ছা বলত, এখন থেকে সমস্ত জীবন যদি তোমাকে আমার কাছে রাখি, থাকতে পারবে?

সুলতা একটু অস্থির হয়ে বল্‌ল—যাবার সময় একথা আর কেন জিজ্ঞেস করছেন? একথা জেনে গিয়ে আপনার কি লাভ?

এমনি, বড় সাধ হয়েছে তাই! সতী-সাবিত্রী স্ত্রীলোকের মুখ-নিঃসৃত বাণী আমার বড় ভাল লাগে! আমি শুধু দেখছিলাম, তোমার কোন্ কথার আঘাত পেয়ে মানুষ আত্মহত্যা করে' বসে।

দুটি বিশাল দৃষ্টি তুলে সুলতা তার মুখের দিকে তাকালো। উপেন একটু হেসে বল্‌ল—চোখ নামাও বৌদি, তোমার ও-দৃষ্টির কাছে সতীত্বের এবং অসতীত্বের কোনো আলোচনাই চলতে পারে

না! আচ্ছা, আমি যদি বলি, যে-কোনো পুরুষ, যে-কোনো নারীকেই তুমি একই রকম ভালোবাসতে পারো তাহ'লে কি খুব ভুল করবো? যদি বলি তোমার জাত নেই, ধর্ম্ম নেই, সমাজ নেই, নীতি নেই—তুমি শুধু নারী, শুধু ফোটবার জন্যেই ফুটে উঠেছ—তা'হলেও কি খুব,—দেখ দেখি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে? কে যেন ডাকছেন?

সুলতা মুখ ফিরিয়ে ওপরতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—আমার দেওর! এখুনি চলে যাচ্ছেন! উঁহু—না, উনি আর থাকতে চান না।

উপেন বল্‌ল—কে? কার সঙ্গে কথা কইলে?

সুলতা বল্‌ল—দেখেননি বুঝি? উনি সন্ন্যাসিনী। কাশীতে কি কি সব কাজের জন্যে এসেছেন! এসেছেন হরিদ্বার থেকে।

বেলা দুটো লাগাৎ উপেন জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নেমে এল। সুলতাও এল পিছনে পিছনে। দরজার বাইরে এসে উপেন বল্‌ল—বিদায়ের দৃশ্যকে মনোহর করে আর কাজ নেই। সুলতা তুমি এবার ওপরে যাও।

সুলতা বল্‌ল—কবে আসবেন বলুন!

উপেন করুণ হাসি হেসে বল্‌ল—গ্রহতারার চক্রে আবার কোথাও দেখা হয়েও যেতে পারে! অনেক অপরাধ ক'রে গেলাম, ক্ষমা করো।

সুলতা হেঁট হয়ে তার পায়ের ধূলো নিতেই উপেন তাকে দুই হাত ধরে' তুল্‌লো। বল্‌ল—পায়ের ধূলো নিয়ে কেন আমাকে অকারণ গৌরবে বড় করে' তুল্‌চ সুলতা?

হাত দুটি ধরে' কয়েক মুহূর্ত্ত সে কি-যেন চিন্তা করল, তারপর একটি ছোট্ট অলক্ষ্য নিঃশ্বাস ফেলে সে সুলতাকে ছেড়ে দিয়ে ব্যাগটা হাতে তুলে' নিল। ব্যাগটা নিয়ে রাস্তায় নেমে কিয়দ্দূর গিয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে' থম্‌কে দাঁড়ালো। সুলতা তখনো তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

উপেন একটু হাসবার চেষ্টা করল—পারল না, কথা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোঁটই কাঁপল, কথা বেরুলো না!

আবার সে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। পানের একটা দোকান পার হয়ে সে যখন নিতান্তই চোখের আড়ালে চলে গেল, স্নলতা তখন দরজার কপাটে মাথা হেলিয়ে কান্না আর সামলাতে পারল না, ফুলে' ফুলে' সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগল! মাটীর বন্ধন থেকে শিউরে টেনে ছিঁড়লে মাটীর বুক ক্ষত-বিক্ষত হয় বৈ কি।

নয়

সন্ন্যাসিনী!

পরিণত যৌবন, কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিষ্ট—শীর্ণ! দেহটি ঠিক দেহ নয়,—দেহযষ্টি! কপালখানি ছোট, ঘাড় অবধি কোঁকড়ানো কালো কালো ঝাঁপা ঝাঁপা চুল, চোখ দুটি দিঘীর জলের মত স্বচ্ছ, গভীর এবং মমতাময়,—পাতলা দুখানি ঠোঁট, নাকটি বাঁশীর মত; মুখখানি ঠিক বিষণ্ণ নয়—অরণ্যের মত উদাসীন।

পরণে গেরুয়া রঙের একটি সাড়ী ও সেমিজ। পায়ে গেরুয়া রঙের ক্যাম্বিশদড়ির জুতো!

সন্ন্যাসিনী ওপর থেকে নেমে এলেন। পিছনে পিছনে এল আর একটি সমবয়স্কা যুবতী মেয়ে; বোধ করি শিষ্য হবে।

—মামা তোমার আসবেন কবে, হ্যাঁ মা?

স্নলতা অশ্রুপূর্ণ দুটি চোখ তুললো। ঘাড় নেড়ে জানালো, সে জানে না।

আহা! মা, তোমার মতন মেয়েরও এমন হয়? সকাল থেকে আমি কেবল তোমার কথাই ভাবছি মা!

ছোট্ট পাখীটির মত সন্ন্যাসিনীর গলার আওয়াজ। এই করুণ মৃদু কণ্ঠের মমতাটুকু, মনে হল সুলতার অন্তরের বহুদূর পর্য্যন্ত একটি সুনিবিড় মাধুর্য্যে ভরে তুল্‌লো। কোনো কোনো কণ্ঠস্বর মানুষকে মোহাবিষ্ট করেই তোলে!

এখন তবে কার কাছে থাকবে মা?

সুলতা বল্‌ল—মামীমা আসবেন কিছু দিনের মধ্যেই!

ও আচ্ছা, তবে এ-কদিন তুমি আমার কাছেই থেকো মা! নীচে বুড়ি মার কাছে থাকা তোমার ত ভাল লাগবে না?—সুলতার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সন্ন্যাসিনী আবার বললেন—শীতলা, তুমি এঁর রান্নার ব্যবস্থা আমার কাছেই করো! আহা মা, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে দেখে অবধি। দুঃখকে আমরা অস্বীকার করলেও দুঃখ থেকে যায় মা। সবাই আমাদের ছেড়ে যায়, দুঃখ কিন্তু আমাদের কাছছাড়া হয় না আমরা আশ্রয় না দিলে সে যায় কোথায়? আহা মা—

সুলতা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত্ত থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর নিতান্ত ভক্তিভরে মাটীতে বসে' পড়ে' দুই হাতে পায়ের ধূলো মুখে ও মাথায় তুললো!

প্রণাম করে' সে উঠে দাঁড়াল। বল্‌ল—আপনাকে কি বলে' ডাকবো?

আমাকে?—সন্ন্যাসিনী অল্প একটুখানি স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। হেসে অতি মৃদু কণ্ঠে বললেন—কি বলে' ডাকবে? আমার নাম মা!

সুলতা ঘাড় নেড়ে তাতেই রাজী হল। তারপর চোখ তুলে মায়ের স্মিত মুখখানির প্রতি তাকিয়ে তার মনে হল, এর চেয়ে বড় আশ্রয় তার আর নেই! মায়ের চোখে মমতা, কণ্ঠে কারুণ্য, হৃদয়ে অপরিসীম সহানুভূতি—সন্ন্যাসিনী তার হারানো মাতৃস্নেহের স্বপ্নকে বহন করে, এনেছে।

শীতলা বোধ করি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতেই ওপরে উঠে গেল!

আনন্দের একটি অব্যক্ত বেদনায় সুলতার চোখ দুটি দিয়ে জলধারা

নেমে এসেছিল। মা কাছে এলেন। মাথাটি টেনে বুকের মধ্যে নিয়ে পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন—এমন করলে ত চলবে না মা, আমি যে তোমার সকল কথাই বুঝতে পারি! হয়ত ঠিক সময়টিতেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, তোমাকে যে আমি দেখেই চিনেছি! আহা মা—

অবরুদ্ধ কণ্ঠে সুলতা শুধু বল্‌ল—এখানে ছাড়া আর আমার কোথাও জায়গা নেই মা!

সন্ন্যাসিনীও তার উত্তরে কেবল বললেন—ভয় থাকলে ত জীবনে কোনো আনন্দ নেই মা! ভয়কে জয় করতে হবে যে!

সুলতা চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

সন্ন্যাসিনীর সত্যকারের কোনো পরিচয়ই ছিল না! সাজানো ধবধবে দাঁতগুলিতে ও আয়ত দুটি ঘননীল চোখে সুন্দর একটুখানি হাসি হেসে বলেন—জাত? জাত ত আমার নেই মা; মানুষ—এ ছাড়া আর কোনো কথাই ত বলা চলে না! তা ছাড়া ভুলতে যাকে হবে তাকে ভোলাই ত ভাল মা!

মা যখন কথা বলেন মনে হয় তিনি যেন নিজেকেই বল্‌ছেন! নিজের কথা নিজে শুনেই তাঁর যেন সকলের চেয়ে বড় তৃপ্তি। মুখটি কথা বলে, মনটি থাকে কান পেতে। বয়সের দিক দিয়ে মা হবার অধিকার তাঁর নেই, দার্শনিকতাও তাঁর মুখে ঠিক মানায় না। তবু সমস্তটাই যেন তাঁর সকল হাবভাবে, গতিতে-ভঙ্গীতে, কথাবার্ত্তায়, পোষাক-পরিচ্ছদে বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

নির্জ্জন একাকীত্ব সুলতার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আপনার মনে কোথাও চুপ ক'রে বসে সে মায়ের কথাগুলি নিয়ে নেড়েচেড়ে একটু একটু করে' উপভোগ করে। এ যেন এক সে নূতন জীবনের মাঝখানে এসে পড়েছে। মত্ত উত্তেজনায় নিত্যস্রোতের বেগে যে-জীবন আঘাত

পেয়ে পেয়ে আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরে ঘুরে চলে, যে-জীবন মন্থনে ওঠে জ্বালা, বেদনা, শোক, হিংসা, হলাহল,—এ-জীবন সে নয়! এখানে মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, ধুপ-ধুনা চন্দনের সংমিশ্রিত গন্ধের মায়া সাধু-সন্ন্যাসী-ভিখারীর ছন্দছাড়া বাঁধনহারা জীবন,—দেব দেবী-পূজারী, মোহান্ত-ভৈরবী-নাগা প্রভৃতির এখানে অবাধ একাকার রাজ-রাজত্ব! এমনটি স্থলতা আর কোনো দিন দেখেনি। ধর্ম্মভাবের একটি একান্ত স্নিগ্ধতা, একটি সুন্দর প্রার্থনার আবহাওয়া, বেদনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে এমন দুর্লভ ইঙ্গিত—সমস্ত আকাশ বাতাসকে মনোরম করে' রেখেছে। যাকে পেয়ে স্থলতার জীবন যেন সার্থক হয়ে ছিল! একটি অপূর্ব্ব শুচিতার ভেতর দিয়ে তার দিন কাটে।

সেদিন সকাল বেলায় স্থলতা যখন পূজার ঘরের দোরের কাছে এসে দাঁড়াল তখন সহজে তাকে আর চেনবারই যো নেই। চন্দন-চর্চ্চিত তার কপাল, মাথার চুল পেছন দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়ানো, গলায় এক-গাছি ছোট রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা, পরণে একখানি পুরু গেরুয়া থান —দুহাতে শুধু দুগাছি সোনার চুড়ি—চুড়ি দুগাছি তাকে আর খুলতে দেওয়া হয়নি। এসে দাঁড়ালো মূর্ত্তিমতী একটি স্তবের মত!

পুষ্পপাত্রটি দুহাতে ধরে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—জবাফুল ত এখন পাওয়া গেল না মা?

মা বললেন—গেল না? আহা মা, শিবের পূজোয় ত জবাফুল লাগে না! তাঁর পূজো আকন্দে, ধুঁতরোয়—তাঁর পূজো হয় বকফুলে!

ও! বলে' স্থলতা ভেতরে ঢুকে ফলের থালাখানি নামিয়ে রাখল। সন্ন্যাসিনী একবার সেদিকে তাকিয়ে একটি বেলপাতা হাতে তুলে নিয়ে বললেন—পাগলি, বেলপাতা কি এমনি করে' বাছে? আহা মা, বেলপাতা হবে তেপত্তর! তিনটি পাতা ত্রিশূলের মত দেখাবে। বেলপাতা মনের মতন ক'রে পেলে ভোলানাথ সব ভুলে যান্!

সুলতা বলল—জবার কথা তখন যে বলছিলেন ?

মা একটু হাস্‌লেন! বললেন—দিনে শিব পূজো মা, জবা দিয়ে রাতে হবে মুণ্ডমালিনীর সেবা। সন্ধ্যে বেলায় শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন।

ও!—সুলতা যেন এতক্ষণে সমস্তই বুঝতে পারল।

মা ও শীতলার পুজার পর সুলতা গিয়ে অন্য একখানি আসনে বসে। পূজার সে না-জানে কোনো মন্ত্র, না-কোনো রীতি। আচমনের জল কেমন করে' ব্যবহার করতে হয় তা পর্য্যন্ত তার এতটুকু জানা নেই! গঙ্গাজলের ঘটির মধ্যে একখানি কুশী উপুড় করে' রেখে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে' সে চোখ বোজে।

কিন্তু চোখ বুজলেই পূজো হয় না! হাত নাকি কেমন এক বিশেষ ভঙ্গীতে ঘুরোতে হয়, মৃত্তিকার টিপ্ দিতে হয় কপালে, চন্দনের ফোঁটা দিতে হয় নানা অঙ্গে! পূজার এই সামান্য ভূমিকাগুলি পর্য্যন্ত তার একেবারে অজ্ঞাত।

—ঘুরে বসো মা, না না—ও হোলো না! জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসো। আহ্নিকে বসতে হয় পুব দিকে মুখ ফিরিয়ে!

তাইত, এই সামান্য কথাটাও তার জানা ছিল না? লজ্জায় সুলতার মুখখানি, টক্‌টকে রাঙা হয়ে ওঠে!

মা পাশে বসে' তাকে সমস্তই দেখিয়ে দেন। পরম যত্নে এবং পরম আগ্রহে নৈবেদ্যের থালা সাজিয়ে সুলতা ফল-পাকর কাট্‌তে বসে! সকল কাজেই তার দেরী হয় কিন্তু কোথাও খুঁৎ সে এতটুকু রাখে না। দেবতার নৈবেদ্য সাজাতেই যেন তার এই সুন্দর দুটি হাত তৈরী হয়েছিল। পূজার সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে করতে দুনিয়ার আর কোনো বস্তুর সম্বন্ধেই তার কৌতূহল থাকে না, কোনো কাজের প্রতিই যেন তার আর খেয়াল নেই—একান্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে এক একটি ফুল ফল পাতা সাজিয়ে গুছিয়ে যত্ন করে' রাখে। আজকাল সে নিজেই

আশ্চর্য্য হয়ে যায়, দেবতার এতবড় নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে সে এতদিন ছিল কোথায়? জীবনকে সুন্দর ক'রে সহজ ক'রে নির্ম্মল ক'রে ফুটিয়ে তোলবার এই যে সুবৃহৎ ক্ষেত্র তার চোখের সুমুখে অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল, এর সন্ধান কি আজ পর্য্যন্ত তাকে কেউ দিল না?

মন্দিরে মন্দিরে যখন আরতির শঙ্খঘণ্টা বেজে ওঠে, সেই ধ্বনিকে আশ্রয় করে' সুলতার সমস্ত মন পাখীর মত পক্ষ বিস্তার করে' বহুদূর পর্য্যন্ত উড়ে উড়ে যায়—দূরে, আরও দূরে...অনেক উঁচুতে, শূন্য লোকের অসীম আকাশের মধ্যে। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড যাত্রীঘরের চূড়ায় যখন সানাইতে ইমন-কল্যাণ বাজতে থাকে, চাঁদের আলোয় তখন হয়ত নদীর জল ঝলকে ঝলকে ছুটে চলেছে, ওপারের পুঞ্জীভূত নিস্তব্ধ অরণ্য-রেখা চন্দ্রালোকের স্পর্শে স্বপ্নরাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে—সেই সময় ভীরু দীপশিখার মত সুলতার ছোট প্রাণ থর থর করে' কাঁপতে থাকে। মন যেখানে উড়ে চলে গেছে, হৃদয় এবং প্রাণ সেখানে যাবার জন্য আকুলি বিকুলি করে।

সমস্ত সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত পূজায় কাটে। আহারাদির ব্যাপারটি, অতি সামান্যই—সমস্ত দিনের মধ্যে এটি কোন্ সময় যে শেষ হয়ে যায় তা কারো দৃষ্টিতেই পড়ে না। তারপর বিশ্রাম অতি অল্পক্ষণ! দুপুর বেলা মায়ের সঙ্গে সে যায় 'গোপাল বাড়ী' হরিসভায়, সেখান থেকে উঠে যায় বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতি দর্শনে। বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যায়,—শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন, কিন্তু তা হোক—এই জীবনই মানুষের চিরদিনের অভিপ্রেত। রাতের বেলায় একটি টিম্‌টিমে আলো জ্বেলে মাকে সুলতা গীতার বাঙলা অনুবাদ পড়ে পড়ে শোনায়।

মা বলেন—জ্ঞানের সীমা আমার বড়ই ছোট, বুঝলে মা? নিজে যেটুকু বুঝতে পারি তোমাকেও সেটুকু দিতে পারবো বোধ হয়! যে কথা আমাদের ভাবায় সেই কথাই হচ্ছে জ্ঞানের কথা!

দীপশিখার পাশ দিয়ে সুলতার দুটি বড় বড় কালো অচঞ্চল চোখ এবং স্নিগ্ধ শান্ত ও সুন্দর মুখখানি মায়ের নজরে পড়ে। মায়ের মুখের প্রতি খানিকক্ষণ তাকিয়ে সুলতা আবার বইএর পাতা উল্টে নেয়।

অনেকক্ষণ রাত পর্য্যন্ত পড়তে পড়তে কোন্ এক সময় তন্দ্রায় সে দেয়ালে মাথা কাৎ করে ঢুলে পড়ে। মা উঠে পরম স্নেহে তার গায়ে হাত দিয়ে বলেন—এসো মা, শোবে এসো, আহা মা, এত' তোমার অভ্যেস নেই, কষ্ট হবে বৈকি!

সুলতা জেগে উঠে। বলে—ও ভুলে গেছি, আমি বড় ঘুম কাতুরে!

মায়ের অনুরোধ সত্বেও সুলতা আর ঘুমোয় না! যতক্ষণ সে পারে জেগে থাকে এই আনন্দ, এই তৃপ্তি, এই শান্তিকে উপভোগ করে' নিতে চায়।

—গাছ তলায় বসলে কেন মা? পায়ের কাছে কেউ বসলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। এবার তুমি শুয়ে পড় মা।

সুলতা শোনে না, আস্তে আস্তে মায়ের পা দুখানিতে হাত বুলিয়ে দেয়। গভীর রাত পর্য্যন্ত এমন অক্লান্ত পদ-সেবায় মা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন। সুলতার চেয়ে বয়সে তিনি কতই-বা বড়। বড় জোর বছর তিনেকের! কিন্তু সমবয়সের সংস্কার সুলতার মনেই থাকে না। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে গৌরবে মা যে তার চেয়ে অনেক উঁচুতে এ যেন কেমন করে তার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে। দেবতাকে সে চোখে দেখেনি কিন্তু মনে হয়—এমনিই। মুখে এমনিই স্বর্গীয় দীপ্তি, হাসিতে আশীর্ব্বাদ, চোখে প্রীতি, হাতে বরাভয়, অঙ্গে এমনিই ঐশ্বর্য্য! মা যেন তার এ জগতে থেকেও নেই, দেবলোকের সঙ্গে তাঁর যেন একটি অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ আছে; বিধাতার বাণীকে মা যেন বহন করে' এনেছেন!

গভীর রাতের ছম্‌ছমে অন্ধকারে সুলতা মার পায়ের ওপর ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে মাথা লুটিয়ে দেয়। পায়ের মধ্যে মুখ

গুঁজে মাথা সে আর তুলতেই চায় না। নিদ্রিতা যার পা দুখানি সে চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়।

খানিকক্ষণ পরে পা দুখানি ছেড়ে দিয়ে সে উঠে আসে। ঘুম তার চোখ থেকে চলে যায়। জানালার ধারে চুপ করে' সে খণ্ড আকাশের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। গত জীবনের কথা এতটুকুও তার মনে পড়ে না,—যত কিছু তার বর্ত্তমানকে নিয়ে। এই জীবনের সকল পাওয়া যদি তার শেষ হয়ে গিয়ে থাকে ত তার এতটুকুও দুঃখ নেই, যে অবলম্বনটিকে সে হাতের মধ্যে পেয়েছে একে নিয়েই সে তার জীবনের সকল ছোট ছোট দুঃখ ও বেদনাগুলিকে পার হয়ে চলে যাবে।

শ্রাবণের প্রথমেই বর্ষা নেমে আসে। ধূলিপথের প্রান্তে আকাশের কোলে কোলে স্নিগ্ধ সজল মেঘ জমে উঠে। বিদেশিনী মেয়েরা রঙিন কাপড় পরে' কদমের গোছা হাতে নিয়ে, কেউ মাথায় গুঁজে, কেউ গলায় ও কোমরে মালা ক'রে দুলিয়ে শাওনের গান গেয়ে গেয়ে রাস্তা পার হয়ে যায়। মেঘের ইঙ্গিত পেয়ে নদীর জল ফুলে ফুলে ওঠে।

তার পর দেখতে দেখতে জল ধারা নেমে আসে। এ বর্ষা সুলতাকে আর চঞ্চল করে না, রক্তের মধ্যে আর দোলা দেয় না,—মনে হয় তার সমস্ত সত্বাকে যেন এক একটি ফোঁটায় স্নিগ্ধ শান্ত করে' দিচ্ছে। ধীরে ধীরে গিয়ে সে খোলা ছাদের ওপর দাঁড়ায়। মাথায় যেন তার ভাগ্য-বিধাতার আশীর্ব্বাদ ঝরে' পড়েছে!

মেঘ-মেদুর বর্ষায় সন্ধ্যা ক্রমশঃ চারিদিকে ঘনিয়ে আসে। সুলতার মন আর ব্যাকুল হয় না, প্রদীপটি জেলে হাতের মধ্যে আড়াল করে' এনে সমস্ত ঘরে আলোক পরিবেশন করে' এক জায়গায় গিয়ে সে গীতার মধ্যে জগতের যত কিছু সে দেখতে পায়, দুনিয়ায় এই গীতা ছাড়া চিন্তা করবার অন্য আর কোন বস্তুই নেই! ওদিকে ঝরঝর করে'

কার্ণিশ বেয়ে জল পড়ে, তেতলার নলের ভেতর থল্‌থল্ করে' জলের শব্দ হয়, জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট্ আসে, জল ও হাওয়া চারিদিকে কান্নার আওয়াজ করে' যায়, নালা-নর্দ্দমা, উঠোন, ওপরের সিঁড়ি, পথ-ঘাট—যা কিছু সমস্তই একে একে জলে ভর্ত্তি হয়ে ওঠে !

সুলতা একবার ওদিক এদিক তাকিয়ে আবার গীতার অনুবাদের মধ্যে মনোনিবেশ করে। গীতার মধ্যে কোথাও বর্ষার বর্ণনা থাকলেই বোধ হয় ভাল হতো! এ বইখানি ছাড়া অন্য কিছু ভাববার তার যেন আর সময়ই নেই! সে যেন সমস্তই ভুলে গেছে !

সন্ন্যাসিনি মা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। এবার বললেন—অন্ন বিতরণ না করলে ক্ষতি নেই কিন্তু পরমান্ন যে সবাইকে দিয়ে খেতে হয় মা ?

সুলতা মুখ তুলে তাকালো। শুধু বল্‌ল—আসুন !

মা বললেন—বসবার আগে শীতলার খোঁজটা আমাদের নিতেই হবে। বৃষ্টি-বাদল হলে শীতলা আর ছুঁচে সুতো পরাতে পারে না মা, মনটা হয়ে যায় তার বিবাগী।

সুলতা এবার উঠে শীতলাকে ডাকবার জন্য পা বাড়ালো।

মা বললেন—শোনো, তাকে ডেকে আনবার আগে এইটি জেনে যাও মা যে, মুখ বুজে কাউকে নালিশ না জানিয়ে চিরদিন যারা অকারণে দুঃখ সয়ে যায়—শীতলা হচ্ছে সেই দলের মেয়ে। তার দুঃখের হদিস আজ অবধি মানুষে পেল না, মানুষের চেয়ে যে বড় সেও পেল না! শীতলাকে এখানে ডেকে আনবার আগে এইটুকু মনে মনে জেনে যাও মা !

সুলতা মায়ের মুখের দিকে একবার স্পষ্ট করে' তাকালো। বাদল-বেলায় স্বল্প অন্ধকারে মনে হ'ল মায়ের কোমল সুন্দর কচি মুখখানির ওপর দুটি চোখের আলো পড়ে স্নিগ্ধ দীপ্তিতে ভরে' গেছে। হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে চলে গেল !

জলের একটা বাল্‌তি পাশে রেখে শীতলা বসে' বসে' মায়ের গেরুয়া কাপড়ে সাবান মাখাচ্ছিল। সুলতাকে পাশে এসে বসে পড়তে দেখে সে একটুখানি হাসল। বল্‌ল—তোমাকে দেখে ভাই আমার কেবলই দুঃখ হয়, কেন আমি পুরুষ হয়ে এলাম না! প্রেমে যদি পড়তাম তাহলে তোমারই প্রেমে!

সুলতা অনুযোগ করে' বল্‌ল—এ সময় বুঝি তোমার এই কাজ দিদি?

মন্দ কি! শীতলা বল্‌ল—শুনেছি বাদলার দিকে চেয়ে বসে' থাকলে প্রিয়-বিরহে চোখে জল আসে। তুমি যে গীতা পড়ছিলে, অক্ষরগুলো ঝাপ্‌সা লাগছিল না?

সুলতা তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর একটু একটু করে' ক্রমে তার মুখখানি চমৎকার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বল্‌ল—উঃ তুমি কিন্তু ভারি চালাক দিদি। এসব জান্‌লে কি করে?

শীতলা খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠ্‌ল। বল্‌ল—পুঁথিগত বিদ্যে!

সাবান লাগানো কাপড়খানা হাত দিয়ে চেপে ধরে' সুলতা বল্‌ল—এবার আমাকে দাও দিদি। তুমি বুঝি সমস্ত সন্ধ্যেটা এই কাজ নিয়েই থাকবে? ভিজে ভিজে অসুখ করবে না?

শীতলা বল্‌ল—হয়ে গেছে! আর দেরী নেই ভাই। মায়ের কাজে কি আর সময় অসময় আছে?

কাপড় কেচে নিঙ্‌ড়ে শীতলা দেয়ালে টাঙিয়ে দিল। তারপর নিজে সে পিছল ফিরে কাপড় কেচে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মা রইলেন পূজার ঘরে। সুলতা গীতাখানি এনে শীতলার ঘরে ঢুক্‌লো।

শীতলা বল্‌ল—দূর! আজ আবার বাইরের বই পড়া কেন? আজ বসে বসে নিজের মনের কথা শুন্‌তে হয়! গীতা আজ মাথায় থাকুন্।

কোনের জানলাটা পূব-মুখো। অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। শীতলা বল্‌ল—দেখ্‌ছিস্, ওপারের বন কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে?

হুঁ!

ওই যে গঙ্গার চড়া আর একটুখানি বাকি আছে, ওটুকু দু' একদিনের মধ্যেই ভরে' যাবে! বর্ষাকালে কাশীর গঙ্গার কী রূপ! এপার ওপার দেখলে ভয় করে!

শীতলার সম্বন্ধে মায়ের মন্তব্যগুলি তখনও সুলতার কানে বাজছিল। বল্‌ল—দিদি, এবার তোমার নিজের কথা বল।

নিজের কথা? পাগ্‌লি কোথাকার! নিজের কথা সমস্তই যে মায়ের পায়ে ঢেলে দিয়েছি! নিজের বলে' ত আমার কিছু নেই ভাই!

সুলতা চুপ করে' রইল। শীতলা হাসতে হাসতে বল্‌ল—বুড়ো মাগি, বিয়েও করলাম না, ঘরও করলাম না—নিজের কথা পাবো কোথায়?

তা বটে! এত বড় আত্মদানের আদর্শ সুলতা সারাজীবনেও দেখেনি!

কোনো গ্লানিই শীতলার মধ্যে ছিল না। কথা যখন সে বলে ভিতরটা যেন তার বাঁশীর মত বাজতে থাকে। সমস্ত জীবনটাই যেন তার নিজের কাছে সহজ হয়ে গেছে!

হাসতে হাসতে সে বল্‌ল—পাঁচ-পাঁচীর মত চেহারা এনে সংসারে কিছুই করতে পারলাম না ভাই। তোমার মতন রূপ থাকলে না হয় বানিয়ে বানিয়েও গল্প বলা যেত! জানলার ধারে দাঁড়ালি কেন ভাই, আয়—

বলে, শীতলা তাকে কোলের কাছে টেনে আন্‌ল। বল্‌ল—ছোট

বোন ত আছিসই, এবার আমার মেয়ে হলি। কিন্তু তুই আমার স্ত্রী হলেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হতো!

সুলতার মুখটি লাল হয়ে উঠল। কাছে বসে সে শীতলার গলা জড়িয়ে ধরে' বল্‌ল—আমি তোমার চুল বেঁধে দেবো দিদি।

শীতলা চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্‌ল—সে কি, মা এসে পড়বেন যে।

পড়লেই বা।

দূর। এসব যে কর্ত্তে নেই। উঠে গিয়ে আগে তুই একবার দেখে আয় তাহলে?

সুলতা বাইরে গিয়ে একবার দেখে এসে চিরুণী হাতে করে' এনে শীতলার পিছন দিকে বসে চুল আঁচড়াতে সুরু করে' দিল।

—দেখিস ভাই, যেন সিঁথে কাটিসনে! তাহলে গেরুয়া ছেড়ে কালা পেড়ে সাড়ী পরতে হবে।

বহুদিন পরে শীতলার মাথায় চিরুণী উঠেছে। আরামে ও স্বস্তিতে তার চোখ বুজে এল। মাথার মধ্যে তার মাটী জমে উঠেছিল।

চুল বাঁধা হয়ে যাবার পর শীতলা বলল—আয়না এনে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ভাই, চুল এবার খুলে এলোমেলো করে' দে'।

সে কি দিদি?

চোখ পাকিয়ে শীতলা বলল—তবে কি সেজেগুজে পান মুখে দিয়ে সন্নিসিগিরি ফলাবো? দে, শিগ্‌গির চুল খুলে দে'।

রাগ করে' হাসতে গিয়ে অলক্ষ্যে তার দুটি চোখ চক্‌চক্ করে উঠল!

অনুকরণ করা সুলতার প্রকৃতি, অনুসরণ করা তার জীবনের ধর্ম্ম। সন্ন্যাসিনী ও শীতলা—দুইটি গাছকে আশ্রয় করে' সে আবার জড়িয়ে গেল! তবু যে নবজীবনের সুপ্রভাত তার চোখের সুমুখে সুরু হয়েছিল, তার চেয়ে কাম্য যেন আর কিছু নেই! অগাধ আকাশে আত্মহারা হয়ে গিয়ে সে শান্তি পেয়েছিল।

অখ্যাত কোনো গাঁয়ের নিতান্ত নগণ্য গৃহস্থের মেয়ে সে। মা-বাপ ছিল না, কোন এক পিসির অনুগ্রহে তার শৈশব গড়ে' উঠেছিল। তাল আর খেজুরের জঙ্গলে, আলো ছায়া ঝিলিমিলি বুড়ো বটগাছের তলায়, চণ্ডীমণ্ডপের আনাচে কানাচে, বাউলদের আখ্ড়ার আশে পাশে কিংবা দীনদাস মুদীর ছোট্ট দোকানটির ঝাপির নীচে—এই সব জায়গাতেই ছিল সুলতার খেলাঘর।

সাত বছরের মেয়ে কিন্তু ভ্রমণের সথ ছিল তার অসাধারণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন অকারণে গ্রামের মধ্যে এবং তার চারিদিকে অক্লান্তভাবে সে টইল্ দিয়ে বেড়াত' কোনো বাধা সুমুখে এসে তাকে রুদ্ধ করত না, ভিতর থেকে একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ এক পথ থেকে আর-এক পথে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চল্‌ত। ছোট খাল যেখানে নদীতে গিয়ে মিশেছে' সেইখানে দাঁড়িয়ে সুলতা প্রায়ই শস্যক্ষেতের দূরাগত গন্ধের প্রতি তাকিয়ে থাকত, বিলের ধারে বসে সে বক ও মাছরাঙার মৎস্য-শিকার লক্ষ্য করত, একাকিনী পল্লীপথের কিনারায় ঘুরে ঘুরে আঁচলের মধ্যে ঝরাফুল ও শুক্‌নো পাতা সঞ্চয় করা ছিল তার অনেক দিনের অভ্যাস। অতি পরিচিত এবং অতি সুলভ বলে' তার গতিবিধির প্রতি নজর দেবার ঔৎসুক্য কারো দেখা যেত না!

আর একটু বড় হলে সে পায়ের ওপর ভর দিয়ে ধানক্ষেতের সীমা নিরীক্ষণ করতে লাগল, আকাশের তারা গোণবার চেষ্টা করল, অঙ্গনের

চারিধারে ফুলের চারা বসাবার জন্য মাটী খুঁড়িতে লাগল, বাতাসের সঙ্গে মুখের শব্দ করে' পাখীর কণ্ঠের অনুকরণ করল। নিরক্ষর রোগ-পীড়িত সেই চাষীদের গ্রামে সে যেন একটি অভিনব জীবনের আস্বাদন এনেছিল।

চুপ করে' সে যখন কোথাও বসে থাকত, মন তার বয়সকে ছাড়িয়ে বহুদুরে চলে' যেত। ভিতরে বিন্দুমাত্রও তার বিষাদ ছিল না, আনন্দ ছিল তার নিত্যসাথী। সূর্য্যাস্তের ও সূর্য্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে সে ভাবত, এই গ্রামের পর মাঠ, তারপর নদী, নদীর ওপারে বন, তারপর পর্ব্বত-কান্তার, তারপর…স্থলতার ব্যাকুল মন আর কুল-কিনারা পেত না। রাত্রির অন্ধকারে ঘরের ভিতর থেকে তার মন ছুটে চল্‌ত। গাছের পাতার ভিতর দিয়ে যে বাতাস গান গেয়ে যায়, স্থলতার মন তার সাথে সাথে পরম আনন্দে নৃত্য করে' যেত। তার বন্ধন ছিল না, পীড়া ছিল না, বেদনা ছিল না, দুঃখ ছিল না। সে যা দেখত তাতেই খুসী হয়ে ওঠা ছিল তার প্রকৃতি, সে যা পেত তাই অপরিসীম তৃপ্তিতে সমস্ত হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করত! সে যেন এ পৃথিবীতে থেকেও নেই! পৃথিবীর সঙ্গে তার যে আত্মীয়তা, সে হচ্ছে ফুলের সঙ্গে গন্ধের, অরণ্যের সঙ্গে ছায়ার, সাগরের সঙ্গে ঢেউয়ের, সৃষ্টির সঙ্গে সৌন্দর্য্যের! তাকে জানতে গেলে অনুভব করতে হতো, ভালবাসতে গেলে দুরে যেতে হতো, তাকে আনন্দ দিতে গেলে আনন্দ আহরণ করতে হতো!

এমনি দিনে গ্রামান্তরের একটি কিশোরকে সে ভালবাসল। হ্যাঁ, নিজে থেকে সে ভালবাসে ওই প্রথম এবং ওই শেষ। নারীর প্রেম মাত্র একটিবারই সম্ভব! ছেলেটি এসেছিল ঝড়ের মত—প্রগল্‌ভ, অস্থির, চকিত-চঞ্চল! মাথায় কালো ঘন কোঁকড়ানো চুল, সম্পূর্ণ মিলিয়েছে বটে! তারপরই সে ভাবে মমতাময়ী মানুর-মা'র কথা। অধরে তলোয়ারের মত একটি সহজ উজ্জ্বল হাসি, কৌতুকে ও মাধুর্য্যে

বড় বড় আয়ত দুটি উজ্জ্বল চোখ, উড্ডীয়মান পাখীর ডানার মত দুটি ভুরু, কঠিন সুপুষ্ট সুগঠিত দেহখানি—গল্প বল্‌ত, গান গাইত, সুলতাকে সাঁতার শেখাতো, নৌকোর ওপর তাকে চড়িয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত দাঁড় বেয়ে নিয়ে যেত। নদীগর্ভের মধ্যে দুজনের ললিত প্রেমগুঞ্জন চল্‌ত।

তারপর সেই চঞ্চল কিশোর একদা কোথায় উধাও হয়ে গেল। খোলা জান্‌লায় অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রখচিত অবারিত আকাশ-পথে সুলতা তার প্রেমাস্পদের অপেক্ষা করতে লাগল। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস—কিন্তু আর সে এল না।

তাল আর খেজুর-জঙ্গলের মাথায় যে আকাশ প্রতি রাত্রে তারকার অঞ্জলি এনে ধরত, প্রাচীর-বেষ্টিত সে আকাশের মধ্যে সুলতা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। সূর্য্যালোকের সাথে সাথে উদয়াচলের আনন্দ-সংবাদ আর আসে না, বাতায়ন-পথের খণ্ড চন্দ্রালোকে আর সে-মাধুর্য্য নেই।

এমন দিনে হল তার বিয়ে। স্বামীকে সে কি ভালবাসল? কে জানে। কিন্তু সে আত্মদান করল, স্বামী এসে তার সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করলেন। ভবঘুরে, সমাজ পরিত্যক্ত, আশ্রয়হীন স্বামীটি—স্নেহে, মমতায়, সহানুভূতিতে সুলতা তাঁকে একান্তভাবেই গ্রহণ কবল।

স্বামীর সেবাই হল তার জীবনের একমাত্র ব্রত! সমস্ত রাত্রি প্রায় জেগে তাঁর মাথাটি কোলের মধ্যে নিয়ে সে চুপ করে' বসে থাকত। স্বামীর জীবনে কোথায় একটি গোপন বেদনা ছিল, সুলতা সেইখানটিতে সান্ত্বনা ঢেলে দেবার চেষ্টা করত। যে-কোনো পুরুষের সংস্পর্শে এলেই তার নারীত্বের সমস্ত মহিমা, অন্তরের নির্ম্মল প্রীতি, মমতার ঐকান্তিক দাক্ষিণ্য একান্তভাবে জেগে উঠত।

প্রেম সুলতার জীবনে ছিল তীর্থক্ষেত্রের মত, সে তীর্থ-সলিল অঞ্জলি ভরে, পান করে' সবাই পরিতৃপ্ত হতে পারত। মানুষ তাকে ভুল বুঝে

ঘৃণাও করেছে, ভালও বেসেছে ; আঘাতও করেছে, উপকারও করেছে ; অপবাদও দিয়েছে, অভ্যর্থনাও করেছে!

কিন্তু প্রিয়কে সে হারিয়ে ছিল, আবার স্বামীকেও সে রাখতে পারল না। নিয়তির ক্রূর কটাক্ষে সন্ন্যাস রোগে স্বামীটি একদিন ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন!

তারপর এল এক উত্তাল, উদ্দাম চরিত্র! সেই নিষ্ঠুর, সেই ভয়ঙ্কর —সমগ্র নারীকে সে গ্রাস করতে চাইল। মধুচক্রের গায়ে মক্ষিকার মত সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় সুলতার সুন্দর দেহখানির ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে থাকত! হ্যাঁ, সত্যেন তার প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুর সঙ্গেই মিশে আছে বটে!

সুলতা হাত পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, আঘাতের চিহ্নগুলি এবার সম্পূর্ণ মিলিয়েছে বটে! তারপরই সে ভাবে মমতাময়ী মানুর-মা'র কথা। অকস্মাৎ মানুর-মাকে মনে করে' তার চোখ দুটি জলে ভরে' আসে!

* * *

সন্ন্যাসিনীর গাম্ভীর্য্য নেই কিন্তু একটি স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। মধ্যাহ্ন যৌবনেই তাঁর জীবনের যেন বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল।

সুলতা তাঁকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে—

মা, আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?

মা একটু হেসে বলেন—নাই বা শুন্‌লে?

সুলতা তাঁর মুখের দিকে তাকায়। খানিকক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, আপনার বিয়ে হয়েছিল মা?

তাই বা কেমন করে' বলি?

কিন্তু এই সরল মেয়েটির প্রশ্নকে এমন করে' এড়িয়ে যেতে সন্ন্যাসিনী একটু লজ্জিত হন। বলেন—জিজ্ঞেসা কিছু করো না মা, গেরুয়া কাপড় গায়ে উঠলে পরিচয়টাকে চেপে রাখতে হয়। আত্মীয় বলব কাকে?

কেউ যে কারো নয়—গেরুয়া ত শুধু এই কথাই বলে!—যাই, মন্দির থেকে একবার ঘুরে আসি।

সুলতা বলে—আমিও যাবো।

যাবে? চল! কিন্তু রোদ লেগে যে সোনামুখে রক্ত ফেটে পড়বে মা? পথের কষ্ট সইতে পারবে?

খুব!—বলে' সুলতা চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় জড়িয়ে মায়ের একেবারে পাশে এসে দাঁড়ায়। এই গেরুয়া পরিহিতা সম-বয়সী মেয়েটির প্রতি মা একবার মুখ তুলে তাকান্। মনে হয়, এই গেরুয়ার সঙ্গে সুলতার কোথায় যেন একটি মিল আছে। এই অপূর্ব্ব রহস্যময় যৌবনকে এম্নি গেরুয়া দিয়ে মুড়লেই যেন সব চেয়ে বেশী মানায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অল্প একটুখানি উত্তেজনায় মুখখানি অতি ঈষৎ রাঙা করে' সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে কেন জানি না, মাথা হেঁট করে' যাবার সময় বলেন—এসো তবে!

পথে নেমে সুলতা পিছু পিছু চলে। পিছু চলতেই সে ভালবাসে।

আচ্ছা মা, আপনি একলা পথ চিনে চিনে এই সমস্ত কাশী সহর ঘুরে বেড়াতে পারেন? একলা ঘোরা কি আপনার অভ্যেস?

মা বলেন—ঠিক একলা নয়, শীতলা আমার সঙ্গেই থাকে সব সময়! কোনো দুর্গম তীর্থই আর আমার বাকি নেই মা, কিন্তু শীতলা না থাকলে আমি এক পাও—

শীতলাদি এমন?—বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুলতা মায়ের পিঠের দিকে তাকিয়ে পিছু পিছু পথ চলে।

মা বলেন—এমনিই সে! সে মেয়ে কিন্তু পুরুষ হলে এর চেয়ে বেশী আর কি হতো? সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়, ঘোড়ায় চড়ে ছুটোছুটি করে, হাওয়া গাড়ীর সঙ্গে দৌড়ায়, আগুন নিয়ে খেলা করে! ভয়? ওটা সে জান্লই না! রাস্তাঘাটে কত দুষ্টু লোককে যে সে শাসন

করেছে, অন্ধ করেছে, কত লোককে যে সে সোজা পথে নিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই !—আরাবল্লীর পাহাড়ে উঠে আমাদের গাড়ীর চাকা পিছ্‌লে ঘোড়াশুদ্ধ যখন হটে' আসতে লাগল, সে বিপদের মুহূর্ত্তে শীতলাই লাফিয়ে পড়ে' চার পাঁচ মণ ভারী একখানা পাথর ঠেলে এনে চাকার মুখ আট্‌কে দিল। গায়ের জোরেও সে কোনো পুরুষের চেয়ে কম নয় ! এই ত, সতেরো আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত সে কোঁচাকাছা দিয়ে কাপড় পরে' পাঞ্জাবী উড়ুনী গায়ে চড়িয়ে বেড়াতো। সে যে মেয়েছেলে এ কথা তার মনেই থাকত না ! এখনও মাঝে মাঝে ভুলে যায়।

এ কেমন করে হয় মা ?

কেমন করে' জান্‌বো, বল মা। ভগবানের সামান্য ভুলটুকু লুকোবার অনেক চেষ্টাই সে করেছিল। শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি, আলো—কোনো পুরুষের চেয়ে তার কম ছিল না।

দুধারি দোকান-পসার দেখতে দেখতে এসে দুজনে মন্দিরের পথে পড়ল। মা বললেন—ভাল শালগ্রাম খুঁজছি, দেখি যদি কোথাও পাই।

কি হবে মা ?

প্রতিষ্ঠা করব যে। সেখানে ত শালগ্রাম নেই !

বিহারের কোনো একটি প্রসিদ্ধ স্থানে মা'র প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রমের গল্প সুলতা ইতিমধ্যেই শুনেছিল। অনাথা মেয়েরা সেখানে আশ্রয় পায়; লেখাপড়া সূঁচ সুতোর কাজ ইত্যাদি নানা শিল্পকর্ম্ম শেখে। আশ্রমের অর্থ সমাগম নিতান্ত মন্দ নয়। মেয়েরা বেশ ভালই থাকে।

মা বল্‌লেন—কাশী ত এই জন্যেই আরো এসেছিলাম। ফিরে যাবার মুখে গোটাকতক জিনিষ পত্র কিনে নিয়ে যাবো এই ছিল ইচ্ছে !

বড় বড় ব্যাকুল চক্ষু তুলে সুলতা বল্‌ল—আপনি চলে যাবেন ?

পাগ্‌লি, তা কান্না এল কেন ? ছি, রাস্তায় চলতে চলতে—আমি

কি আর এখানে থাকতে এসেছি মা, ওদিক ফেললে ত আমার চলবে না লক্ষ্মী—অনেক মেয়ে যে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

মন্দিরে এক জায়গায় তাকে বসিয়ে সন্ন্যাসিনী ঠাকুর দর্শন এবং পূজা সেরে আসতে যান্। সুলতা বসেই থাকে।

চিত্র-বিচিত্রিত লাল পাথরের প্রকাণ্ড মন্দির। নরনারীর অবারিত যাতায়াত সারাদিনে আর কামাই নেই। সাধু-সন্ন্যাসী কোথাও ধ্যানে বসেছে, ব্রহ্মচারী ছাত্ররা গায়ে-মাথায় চন্দন মেখে বেদ-গীতা পাঠ করতে বসে গেছে। ফুলে পাতায় গঙ্গাজলে ধূপ-ধূনায় ঘণ্টার শব্দে মন্ত্রোচ্চারণে মন্দিরের মধ্যে একটি বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নানা বর্ণের নানা জাতির মেয়ে পুরুষের ভিড়ে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

সুলতা বসেই রইল। ডানদিকে একটা পাঁচিলের গায়ে প্রকাণ্ড একটি অশথ গাছের শাখা ঝুলে পড়েছে। গাছের সেই ঘন ডালপালার আড়ালে পাখীর সভার কলরব চলছে। মন্দিরের কার্ণিশের মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়ে উড়ে বসছে। প্রাঙ্গনের চারিদিকে দল বেঁধে ভিখারীর দল বসে গেছে। একটানা এই জীবন-স্রোতের মাঝখানে সুলতা আর থৈ পায় না।

গাছের ভিতর দিয়ে সড়সড়ে হাওয়া মর্ম্মর শব্দে বয়ে যাচ্ছিল, সমস্ত কোলাহলের আড়ালে একটা ঘুঘু পাখী থেকে থেকে ডেকে উঠ্ছে—এই ঘুঘুর ডাক শুনলে সুলতার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। সত্যি কথা বলতে কি, তার জীবনে একটি অবসাদ ঘনিয়ে এসেছিল। বহু পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছে, বহু কষ্টই সে পেয়েছে! অপমানের দুর্ব্বহ বোঝা, কলঙ্কের দুরপনেয় কালিমা, দারিদ্র্যের কশাঘাত, নিয়তির অত্যাচার, —মুখ বুঝেই তাকে সইতে হয়েছে! এত বড় এই পৃথিবীতে এতটুকু আশ্রয় শুধু সে চেয়েছিল।—শান্তি-সুনিবিড় একখানি কুটীর, একটুখানি আলো-বাতাস, নিশ্চিন্ত একটি বিশ্রাম, প্রিয়তম একটি মানুষ,—বেদনা-

অর্জ্জরিত তার ক্ষুধিত আত্মা শুধু এইটুকুই কামনা করেছিল। বাল্য-জীবনই যে তার ছিল ভাল! ছোট্ট একখানি গ্রাম, সরু একটি নদী, একখানি ধানক্ষেত, একটুখানি জঙ্গল,—সে স্বপ্ন তার গেল কোথায়? বাল্য জীবন যে তার সব চেয়ে বড় সম্পদ!

মিথ্যা নয়,—এ কথা মিথ্যা নয় যে সুলতা বিশ্রাম চায়। এ সংসারের কাছে বিশ্রাম চাওয়া ছাড়া তার আর কোনো দাবীই নেই! মানুষের কাছে সে নির্ব্বাসন-শাস্তি পেয়েছে, জনসমাজ তাকে আর চায় না; ধর্ম্মের কাছে, নীতির কাছে, সুরুচির কাছে তার কোনো ঠাঁই আর নেই,—সে আজ বাতিল হয়ে গেছে।

—চল মা, এসো—আহা, অনেক দেরী হয়ে গেল!

সুলতার চমক ভাঙলো, বুকটা তখনও তার ধক্ ধক্ করছে! কে যেন এতক্ষণ তাকে জলের মধ্যে হাত পা বেঁধে ডুবিয়ে রেখেছিল! সন্ন্যাসিনী তার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন—কি ভাবছিলে? আহা মা—

একটুখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে সুলতা কি যেন বলতে গেল কিন্তু মুখের কথা তার মুখেই রইল!

সন্ন্যাসিনী একবার তার মুখের দিকে তাকালেন। সুলতার মুখশ্রী বার বার দেখতে তাঁর কেমন যেন ভাল লাগে। কালো চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতে গেলে তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি যে সন্ন্যাসিনী, তিনি যে গৃহহীনা, রূপ যৌবন-দেহ-ভালবাসা চিরদিনের জন্য যে তাঁকে ভুলে যেতে হয়েছে এ কথা তিনি ভুলে যান্। নারী হয়ে নারীর রূপ তাঁকে অভিভূত করে' তোলে!

আর কিছু না বলে' সুমুখের দিকে পা বাড়িয়ে তিনি চল্‌তে সুরু করেন। সুলতা আবার যখন তাঁর পিছু পিছু আসে, তাঁর ভয় করে! এই রূপবতী নারীটি গোপনে অসমাপ্ত ভোগের পিপাসা ও ক্ষুধিত জীবনের ইঙ্গিত নিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর চোখের উপর থাকবে? এই

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী নারীটির ওপর সন্ন্যাসের প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি ত তাঁর নেই! দেবতার নির্ম্মাল্য দিয়ে দেবতার পূজা ত চলে না!

বাসায় পৌঁছতে সেদিন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল!

শীতলা এল, মা'র পায়ের ওপর প্রণাম করে' বল্‌ল—পূজো কি আজ মন্দিরেই সেরে এলেন?

মা বললেন—জপটা শুধু বাকি আছে।—বলে চলে' গেলেন।

শীতলা ও সুলতা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। জপ ত বাকি থাকার কথা নয়! মা'র এই অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে চলে' যাবার কারণ তাদের দুজনের কাছে সমানই রহস্যময় হয়ে রইল! মাকে এতটুকু আন্‌মনা হতে দেখলে শীতলার চক্ষু অন্ধকার হয়ে আসে!

দুজনের মুখে অনেকক্ষণ ধরেই কথা ফুট্‌ল না। শীতলাকে নিঃশব্দে দেওয়ালের দিকে ফিরে থাকতে দেখে মৃদুকণ্ঠে সুলতা বল্‌ল—দিদি?

শীতলা চকিত হয়ে মুখ ফিরালো। বল্‌ল—চুপ কর্ ভাই, প্রশ্ন করিসনে, অনেক কথা আছে যার উত্তর দিতে গেলে ভয় করে!—তারপর মা যে-পথে চলে' গেলেন, সেই দিকে তাকিয়ে শুধু বল্‌ল—এমন ওঁর প্রায়ই হয়; মানুষ ত বটে!

এবং আর সে দাঁড়াল না, কোনমতে মুখ লুকিয়ে সেখান থেকে সরে' গেল!

সুলতা আজকাল অনেক কথাই বুঝতে পারে, কিন্তু শীতলার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনটাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। সুলতা যখন তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো, শীতলা তখন নিজের মনে পাগলের মত মৃদু মৃদু হাসছে। সুলতার কল্পনা আর কতদূরই-বা অগ্রসর হতে পারে! জলচৌকির পাশে সে চুপ করে গিয়ে বস্‌লো।

শীতলা মুখ ফিরালো। মুখ টিপে হেসে বল্‌ল—ভাবচিস বোধ হয়, এ আবার কি!—কেমন? এরা ত বেশ ছিল, গেরুয়া পরা দুটো মেয়ে

বিদ্যি ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দিয়ে পুজো-আশ্রা করে’ দিন কাটাচ্ছিল। এদের গায়ে আবার কোন্‌দিকের বাতাস বয়! এই কথাই ভাবচিস, না রে?

স্থলতা করুণ মুখখানি নেড়ে জানালো, এই কথাই সে ভাবছে !

এমনিই!—শীতলা একবার হাসল। হেসে বল্‌ল—জীবনটা কোনো বাঁধন সইতে পারে না। গেরুয়ারও না, বেনারসী সাড়ীরও না! একে চলনসই করে’ মানাবার জন্য কত চাবুকই না মারতে হয়েছে ভাই, তা আর কি বলব। আফিঙ খাইয়ে কতবার তাকে বিকল করলাম, আত্মহত্যার কত সুযোগই তাকে দিলাম, কিন্তু হায়রে স্থলু—পাওনা-গণ্ডা সে ছাড়বে কেন বল্‌ত? জিব বার’ করে’ অনেক চোখের জলই যে সে চেটে খেয়েছে! সাপের বিষ নেই বললেই কি সে অম্‌নি ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে?

নিজের মনেই শীতলা থেমে থেমে হাস্‌তে লাগল। কথা যার সঙ্গে তার চলছিল সে যেন স্থলতা নয়, অন্য কেউ! শীতলা তাকে বেশ করেই জানে!

শীতলা চট্ করে আবার বল্‌ল—আচ্ছা মাকে দেখে তোর কি মনে হয় বল্ দেখি ভাই?

স্থলতা সাগ্রহ কণ্ঠে বল্‌ল—কি করে জানবো দিদি?

তা বটে, আমিই কি জানি যে তোকে বল্‌ব? মাথা রুক্ষু কেন? আজ বুঝি গঙ্গাস্নান হয়নি?

না।

তবে যা ভাই তাড়াতাড়ি, দেখিস যেন ডুব দিতে গিয়ে মনের দুঃখে ডুব দিসনে। তবে শুধু তোর রূপটাকে যদি মা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসতে পারতিস্ ত মায়ের মন আবার গীতায় বসে যেত।—বলে’ ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের মনেই শীতলা আবার হাসতে সুরু করে’ দিল।

সুলতা একটুখানি দাঁড়ালো, কিছুই সে বুঝতে পারল না, তারপর গামছাখানি কাঁধে ফেলে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল!

আঃ—রাস্তায় নেমে প্রাণটা যেন তার বাঁচ্‌ল! ঘরের মধ্যে হাওয়াটা এতক্ষণ যেন ঘুলিয়ে উঠছিল। এবার মুক্তি! মুক্তিই সে যায়।

সংস্কার থেকে মুক্তি, বন্ধন থেকে মুক্তি, দেবতার পূজা-উপকরণের জন্য সে এই পৃথিবীতে এসেছিল কিন্তু মানুষ তাকে সে-মুক্তি দিল না।

রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের ছায়া পথে ঘাটে নেমে এসেছে। খানিকক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় বাতাসটি বেশ স্নিগ্ধ। সুলতা একবার দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ করে' একটি নিশ্বাস টেনে নিল। একাকিনী সে আজ বহুকাল পরে পথ চল্‌তে পেরেছে—এই অল্প সময়ের আনন্দটুকু সে যে কেমন করে উপভোগ করে' নেবে, তাই সে ভাবতে লাগল। মনে হল, সঙ্গীও ত তার কেউ নেই! সুমুখে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, কাছে দূরে—কই, সঙ্গীর ত কোনো চিহ্নই কোনদিন ছিল না! চারিদিক থেকে বরং জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্র তাকে পথের ইঙ্গিত করে' হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। আচ্ছা, বেশ তাই হোক—এঁকে বেঁকে টাল খেয়ে হেলে দুলে সে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল।

কিছুদূর এসে একটা গলির বাঁক ফিরতেই প্রকাণ্ড একটা অশথ গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার দৃশ্য তার চোখে পড়ল। এই গঙ্গার দিকে তাকালেই উপেনকে তার মনে পড়ে। আশ্চর্য্য উপেন। কপালে হাত তুলে সুলতা তাকে একটা প্রণামই জানিয়ে দিল! উপেন তার ধ্যানলোকের মানুষ! উপেন তার অনেকখানি।

হ্যাঁ, জীবনে ভালবাসাকে সে পিঞ্জরাবদ্ধ করেনি! মুক্ত বিহঙ্গের মত তার সে প্রেম উড়ে উড়ে বহু জায়গায় বসে বহু গান গেয়ে বহু মানুষকে পরিতৃপ্ত করেছে। নিঃসঙ্কোচ ও নির্ব্বিকার আনন্দে সুলতা সকলের ভালবাসাকে গ্রহণ করেছে! বিবাহের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে কেউ

তার জীবনকে আবদ্ধ করেনি, প্রেমের কথা সেই ত সকলের চেয়ে বেশী জানে! নরনারীর সামান্য দেহের টানে প্রেম ত তার বাঁধা পড়েনি!

গঙ্গার ধারে সে এসে দাঁড়াল। ওপারে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রান্তর ছুটে গেছে, বাঁ দিকে দূরে খানিকটা জঙ্গলের রেখা, তারই কোলে মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্রের সবুজ তালি দেওয়া মাঠ,—ওখানে হয়ত ছোট ছোট বন-বিহঙ্গের অক্লান্ত কূজন-ধ্বনি চল্‌ছে। এই জীবনের নেশায় সুলতার চোখ দুটি মোহাবিষ্ট হয়ে এল। পরাজয়ের বেদনায়, অপমানের লজ্জায় চিরদিনই সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে কিন্তু সব চেয়ে বড় আনন্দই যে সে আবিষ্কার ক'রে বসে রয়েছে। পৃথিবী জয় সে করেনি কিন্তু ভালবাসার সহজ পথটি যে তার একেবারে করতলগত!

ঘাটে ভিড় নেই, স্নান সেরে প্রায় সবাই একে একে চলে গেছে। কয়েকটা উলঙ্গ হিন্দুস্থানী ছেলে মেয়ে সাঁতার দেবার নামে জলের ওপর মাতামাতি করছিল। ওপারের বালুচড়ার ওপর রৌদ্রালোক জল্‌জল্ করছে। যে বিশাল অশথ গাছটি ঘাটের ধারে প্রায় ঝুঁকে পড়েছে, তারই ছায়া-ঝিলিমিলির মধ্যে মধ্যাহ্ন রৌদ্রের গান একটি উদাস একঘেয়ে সুরে মর্ম্মর-ধ্বনি তুলেছিলো। সুলতার সমস্ত মন মুগ্ধ হয়ে সেই ধ্বনির প্রতি কান খাড়া করে' রইল!

পাশের নির্জ্জন ঘাটে 'ছত্রির' তলায় এক সাধু আস্তানা করেছিল। সুমুখেই ধুনি জ্বলছে। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীটি প্রায় নগ্ন দেহে আভাঙ করে' বিভূতি মেখে বসে রয়েছে; তারই একটি অল্পবয়সী শিষ্য এইমাত্র ঘাট থেকে জল তুলে আন্‌ল। সুলতা সেই দিকে তাকিয়ে ছিল, এমন সময় একটি বৃদ্ধা সধবার পিছনে পিছনে একটি সুন্দর যুবক, একটি সুন্দরী যুবতী ও একটি ফুঁটফুটে ছোট মেয়ে—খুব সম্ভব যুবকটির স্ত্রী ও কন্যা—সবাই মিলে এসে জলের ধারে দাঁড়াল। বৃদ্ধাটি অঞ্জলি করে' জল তুলে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী ও বালিকাটির মাথায় স্পর্শ করালেন! স্বামী-স্ত্রী হেঁট

হয়ে তার পায়ে প্রণাম করল, বৃদ্ধা চোখ বুজে আশীর্ব্বাদ করলেন ! বোধ করি বিদেশের যাত্রী হবে ! সবাই মিলে আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। যাবার সময় স্থলতার দিকে ফিরে কি যেন তারা বলাবলি করল !

ছোট-খাটো জীবনের এই বিচিত্র স্থরগুলি স্থলতার চিরদিনই ভাল লাগে ! স্বামী-স্ত্রীর এই আসা ও চলে' যাওয়াটুকু যে-আনন্দ তাকে দিয়ে গেল, স্থলতা তার জন্য চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকবে ! দুটি নরনারীর মিলিত জীবনের মাধুর্য্য তার কাছে অনেক বড় !

নৌকায় চড়ে একদল যাত্রী রামনগরের দিকে চলেছে। এই নির্জ্জন মধ্যাহ্নে একাকী নদীগর্ভে চলতে চলতে একজন হিন্দুস্থানী ভজনের স্থরে দেহতত্ত্বের গান ধরেছে। অদূরে একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে সাবান দিয়ে কাপড় কাচতে কাচতে হাত থামিয়ে রইল ! সেখানি ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যাবার পর আর একখানি নৌকা কাছে এল। তারাও যাত্রী। বিদেশিনী একদল মেয়ে সেজে গুজে কদম্বের গোছা হাতে নিয়ে সুমধুর কণ্ঠে কাজরীর গান গাইতে স্থরু করেছে। একটি লোক সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে ! আকাশের পূর্ব্ব প্রান্তে তখন একখানা কালো মেঘ দেখা দিয়েছে।

রোদের তাতে স্থলতার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছিল। এবার সে উঠে দাঁড়াল। কাজরীর গান তখন অনেকদূরে চলে' গেছে।

ঘাট ছেড়ে সে পাতার ওপর দিয়ে চল্‌তে লাগল ওঘাটের দিকে। এই সুন্দর সহরের নদীতীরবর্ত্তী সমস্ত ঘাটগুলিতে বেড়িয়ে বেড়াতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল ; ওঘাটে উঠে সন্যাসীর 'ছত্রির' কাছে সে এগিয়ে গেল, শিষ্যটি একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল। স্থলতা অতি সঙ্কোচে এবং সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সাধুর সুমুখে গিয়ে করযোড়ে দাঁড়াল। তার পা কাঁপছিল !

অনেকক্ষণ পরে সাধু মুখ তুললেন। চোখে তাঁর কোনো কৌতুহল নেই। একবার তাকিয়ে আবার তিনি যেদিকে চেয়ে ছিলেন ঠিক সেই দিকেই মুখ ফিরিয়ে রইলেন। স্থলতার গেরুয়া তাঁর দৃষ্টি একেবারেই আকর্ষণ করল না!

হেঁট হয়ে মাটীতে ঝুঁকে পড়ে সুলতা তাঁর উদ্দেশ্যে একটি একান্ত প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে চলে' গেল। আকাশ তখন চারিদিকে মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে এসেছে!

ঘাটে এসে আবার সে চুপ করে দাঁড়াল। নদীর জল ছল্ ছল্ করছে। মেঘের ছায়া পড়েছে জলের ওপর! আকাশ যে একেবারে আকুল হয়ে এল! কি হবে? নদী, বালুচড়', এপার ওপার, সমস্ত যে একাকার হয়ে গেল—কেমন করে' তবে আজ সে—?

এ যে মরণের রূপ! মৃত্যু কি আজ চারিদিক থেকে তাকে এমনি করে' বেষ্টন করবে?—না, সুলতা অন্যায় করেনি, অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেয়নি, দুঃখ-দারিদ্র্যকে স্বীকার করেনি, বেদনা অশান্তিকে আমল দেয়নি,—আনন্দ ছিল তার হৃদয়ের দুয়ারে চিরদিন বাঁধা।

সে যে পাপিষ্ঠা, একথা কে বল্‌ল? জীবন ত ছিল তার কাছে তীর্থক্ষেত্র! জ্ঞানী গুণী, ভদ্র সম্ভ্রান্ত,, সাধু সজ্জন, নর নারী, সবাই মিলে তার মন্দিরে পদচিহ্ন রেখে গেছে! মৃত্যু যদি আজ তাকে হরণ করে তবে কি তার মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে?

না,—বরং যে-ধরিত্রী চিরদিন তাকে আনন্দ দিয়ে এসেছে, তার ঋণ শোধ করতে তার কুণ্ঠা সেই! সে ত মাটীরই মেয়ে! ফুল হয়ে ঝরে' পড়ে' মৃত্তিকার কাছে আত্মাঞ্জলি দেওয়াই ত তার জীবনের মহৎ পরিণাম।

—বলি ওরে আবাগি?

চমক ভাঙতেই সুলতা ঘাড় ফেরালো। হেসে লুটিয়ে চঞ্চল হয়ে এসে শীতলা তাকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। বল্‌ল—সাহস

হল না? পারলিনে ডুবতে? জীবনে ত্থ' একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করলিনে?

স্থলতা একবার বলতে গেল—দিদি—

চুপ! শীতলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল—একেই ত জড়িয়ে ধরেছি, দিদি বললে এবার চুমুও খেতে হবে! আয়, নাইয়ে দিই!

শীতলা তাকে টেনে জলের মধ্যে নিয়ে গেল। বল্‌ল—জলের ভেতর লুকিয়ে তোকে আদর করি আয়,—মা ত' আর এখানে নেই যে মোহ-মুক্তির স্বপ্ন দেখতে হবে!

তুজনে পরমানন্দে স্নান করতে লাগল। শীতলা খিল্ খিল্ করে হেসে বল্‌ল—এত দেরী, ভাবলাম বুঝি মেয়েটা কুল ছেড়ে কুলত্যাগ করে' গেল। ও হরি, মরবার এমন স্থযোগ পেয়েও হারালি? বেঁচে থাকার সাহস দেখছি তো ভয়ানক!

এবার স্থলতা ফিক্ করে হেসে ফেললো।

শীতলা বল্‌ল—আমি সাঁতার জানি, ফিরে আসতে পারবো, কিন্তু তোকে যদি ধরে' ডুবিয়ে দিই স্থলু?

স্থলতা বোকার মত বল্‌ল—তাই ভাবছিলাম দিদি।

দিদি বল্‌ল—থাকগে, যাবার সময় তোকে ডুবিয়ে আর পাপ কুড়িয়ে নিয়ে যাই কেন!

যাবে? তোমরা চলে' যাবে দিদি?—স্থলতার গলা কেঁপে উঠ্‌ল।

নিশ্চয়ই! ছটা রিপুকে আমরা যে মা বলে ত্যাগ করেছি রে!

কবে যাবে?

আর চব্বিশ ঘণ্টা বাদে! মায়ের গীতাপাঠ বন্ধ হয়েছে, পুজো-আশ্রা মাথায় উঠেছে, গেরুয়ার ওপর এসেছে অভিমান! তোকে এড়িয়ে না গেলে মার যে আর রক্ষে নেই ভাই!

শীতলার ভিজে আঁচলটা চেপে ধরে স্থলতার চোখে জল এল।

বল্‌ল—আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না দিদি। তুমি যেখানে যাবে আমিও তোমার সঙ্গে—

শীতলা হাসতে হাসতে বল্‌ল—যাবো শ্বশুরবাড়ী, তুই গিয়ে থাক্‌বি সেখানে সতীন্ হয়ে?

সুলতা আঁচল চেপে রইল!

শীতলা বল্‌ল—তোর প্রেম দেখছি স্ত্রী-পুরুষ বাছে না! ওরে আ বাগি, কিছুই ত আমি পাইনি এই ত্রিরিশ বছর পর্য্যন্ত, আঁচল ধরে' আমার মুক্তির পথটাও কি বন্ধ করবি তুই?

সুলতা বল্‌ল—চাইনে তোমার মুক্তি। আমি জানি তুমি কিছুই চাও না, সব তুমি ত্যাগ করেছ!

চিবুকটি তার নেড়ে দিয়ে শীতলা হেসে বল্‌ল—এমন রূপ তোর, আমি পুরুষ হলেই যে ভালো হতো! আর—দেখি কি কর্ত্তে পারি।

ভিজা গেরুয়া কাপড় টেনে টেনে গায়ে জড়িয়ে দুটি সুন্দরী মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগ্‌ল। ঝর ঝর করে' ততক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে!

এগারো

শীর্ণকায়া পার্ব্বত্য নদীটি এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্তের পথের দিকে মিলিয়ে গেছে। বর্ষার ঢল্ নামে, নুড়ির ফাঁক দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে' জলস্রোত আসে' কুল্ কুল্ করে' শব্দ হয়—নদীটি বড় আদুরে।

আদুরে নদীর তীরে গাছের ছায়ায় ভর্-দুপুরের রোদে পাখীর জটলা বসে। ক্বচিৎ এক আধটা গরুও দেখা যায়—মুখ ডুবিয়ে জল খেতে আসে। কাঁচের মত পরিষ্কার এবং ধারালো জল। জলের ধারে শ্যাওলার ওপর পতঙ্গ ঘুরে ঘুরে যায়।

ওই উদাসিনী নিভৃত নদীটিকে নিয়েই যত কিছু।

গ্রাম ত নয়—ছোট্ট পাহাড়ি বসতি! বসতির মধ্যে তিন চারখানি কোঠা, দুটি খড়ো চালা, একটি মন্দির, তারই পাশে ফুলের বাগান আর ডান দিকে একখণ্ড জমীতে শাক-সব্জীর আবাদ।

আবাদ করেছে মেয়েরাই! আঁট সাঁট করে' কোমরে কাপড় বেঁধে চুলের গোছা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে হেসে কপালের ঘাম মুছে মেয়েরাই মাটী খোঁড়ে। আর ওই আশ্রমের চারদিকটা রাঙ্ চিতের বেড়া দিয়ে ঘিরলো—সেও ত' মেয়েরা। মেয়েদের নিয়েই আশ্রম!

আশ্রমটির কাছাকাছি কোথাও লোকালয় নেই। তিনদিকে উঁচু পাহাড় আর একদিকে সুদূর প্রসারিত দিগন্ত,—আদুরে নদীর বাঁক তারই পরপারে জবাফুলের মত রাঙা সূর্য্য ধীরে ধীরে মাঠের নীচে নেমে যায়।

দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের কোলে আর একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চল্‌ছে।

—নাম হবে আলোকনাথ, শীতলা-দি নাম রাখতে পারে চমৎকার! শিবের দিকে মুখ করে' রোজ সূয্যি উঠ্‌বে।

মেয়েরা বলে।

বলে আরো অনেক কথাই,—জঙ্গল যখন কাটা হল, জীবজন্তুর তখন অভাব ছিল না,—নাথের পাহাড়ের ছোট্ট ঝরণাটিতে কবে একটা নেকড়ে বাঘ জল খেতে এসেছিল তারই গল্প বলতে বলতে পৌঢ়া স্নেহময়ী হররমা সবার দিকে হাসি মুখে তাকান্।

পাঁচ বছরে কত বদলই হলো ভাই—মা এলেন শুধু হাতে, রাঙা পেড়ে সাড়ী পরে' নদীর ধারে বসে চোখ বুজে ছিলেন—কেউ সঙ্গে ছিল না! পুণ্যবতীর পুজো মিথ্যে হয় না,—ভগবান দিলেন মাইতি-গিন্নিকে জুটিয়ে! মাইতি-গিন্নির দেখা না পেলে মাকে অনেক বেগ পেতে হত। বন কেটে আশ্রম করা, তায় আবার মেয়েমানুষ—না দেখলে লোকে বিশ্বাসই করত না!

পুরাণো গল্প গুছিয়ে বলতে শুধু হররমাই পারেন।

দূরে একটি মেয়ে একা নদীর পথে চলছিল, তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে কানা-বাসন্তী বল্‌ল—বাবারে বাবা, ওই দেখো রমা-দি—রাজকুমারী চল্‌ল নদীর ধারে গিয়ে বসতে...সত্যি বল্‌ছি, এমন গম্ভীর মেয়ে কোথাও দেখিনি কিন্তু, উঃ—ও রকম একলা-একলা থাক্‌লে আমরা কিন্তু পাগল হয়ে যেতাম! না ভাই মালিনী?

মালিনী কালো! নতমস্তকে ঘাড় হেঁট করে' শুধু বল্‌ল—হুঁ।

হররমা বল্‌লেন—ও বরাবরই অম্‌মি! কথা যত কম বলে ওর মন তত ভাল থাকে! ভাইটা যখন রেখে চলে' গেল, কাল নিয়ে যাবো বলে' আর এলই না,—রাজকুমারী এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌লো না ভাই। সহোদর ভাইয়ের ব্যবহারে অবাক হয়ে চিরদিনের মতন চুপ করে' গেল! রাজকুমারী যতদিন বাঁচবে মানুষকে সে আর ভাল চোখে দেখবে না!

কথাগুলির মধ্যে ঠিক যে সুরটি বেজে ওঠে, মেয়েরা তাতে একেবারে অভ্যস্ত নয়।

কাজ করে মেয়েরাই। রাঁধে, বাসন ধোয়, জল তোলে,—প্রায় তিন কোশ মাঠ ভেঙে দূরের ষ্টেশন থেকে গরুর গাড়ী করে' জিনিস পত্র আনায়,—তাও মেয়েরা! মেয়েদেরই রাজ-রাজত্ব!

স্বাধীনতা আছে সবারই। অল্প জায়গার মধ্যে জটলা পাকিয়ে মাথা গুঁজে থাকবার প্রয়োজন হয় না—দিগন্ত জোড়া মাঠের মাঝখানে খোলা হাওয়ায় প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে দিন কাটে তাদের চমৎকার!

বিজয়া খুব স্পষ্টবক্তা। ঝাঁঝ্ আছে। বলে—লোভ কি সামলানো যায়? পালিয়ে এসে এমন থাকবার জায়গা খুব কমই আছে। গোড়ায় আমি ত একবারে অন্ধকার দেখেছিলাম......

কানা-বাসন্তী তার গা ঠেলে থামাতে যায়। তীব্রকণ্ঠে বিজয়া বলে

—কি হবে লুকিয়ে? অন্যায় করলাম না অথচ বদ্‌নামের ভাগী হলাম, এ রাগ কি আমার সহজে যাবে তুই মনে করিস? তবু বদ্‌নাম সইতে পারি কিন্তু অপমান—? অমন শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করাই ভাল!

ওপাশে অনিলার মুখ চোখ রাঙা হয়ে ওঠে। হররমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ একটুখানি হেসে উঠে চলে' যায়। বিজয়া-দির মুখে কিছু আট্‌কায় না! ছিঃ!

অবসর মত এমনি আলোচনা তাদের হয়ই। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিন্তু বয়সের পার্থক্য-বিচার সব সময় থাকে না, কেউ যে কারো চেয়ে খাটো নয় সেটা এখানে না এলে এমন সহজে আর কিছুতেই বোঝা যায় না! এখানকার মেয়েদের কোনো জাত নেই, ধর্ম্ম নেই, আচার এবং নীতির শাসন ত নেইই।

কানা-বাসন্তী এক পতিতার মেয়ে। কিন্তু তাকে নৈলে কারো চলে না। তা ছাড়া মায়ের পূজোর ফুল তোলবার ভার তারই ওপর। কুমারী অবস্থায় মলিনার পদস্খলন হয়েছিল—এখানে না এসে তার অন্য উপায় ছিল না! মলিনা শীতলার একেবারে ডান হাত। চন্দ্রা অল্প বয়স থেকেই স্বামী-পরিত্যক্তা, ত্যাগ করবার কারণ আজ অবধি সে নিজেও খুঁজে পেল না! আর বিজয়ার কথা ত বিজয়া নিজেই বলে! স্বামীর সহোদর ভাই—দেবরের কাপুরুষতাকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে ফল হয়েছিল উল্‌টো—লোকে ভুল বুঝে বদ্‌নামের কলঙ্কে তাকে আবৃত করে' দিয়েছে! বাপের বাড়ীর পথও বন্ধ হয়ে গেল!

তা যাক্—বিজয়া ও সব কিছুই গ্রাহ্য করে না!

গৌরী আসে, পুষ্প আসে, মেনু আসে, মাইতি-গিন্নির ঘাড় কাঁপে তবু আসে পা পা করে'! দন্তহীন মুখগহ্বর হাসিতে ভর্ত্তি করে' এসে অনর্গল অবোধ্য ভাষায় কথা বলে' যায়। মেয়েরা সবাই তাকে নিয়ে আমোদ করে।

দূরের গ্রাম থেকে চাষীর ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে! আসে দুপুর বেলা, আবার বিকাল বেলায় ছুটি! এ ব্যবস্থাটি করতে শীতলাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কলরব করতে করতে মাঠ পার হয়ে যখন তারা আসে, অনেক দূর থেকেই তাদের সোরগোল শোনা যায়। শীতলার কান দুটি অমনি উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

এক পাল ছেলে মেয়ে। বড় বড় মেয়েরা তাদের ভাগ করে' নিয়ে পড়াতে বসে। শাসনের সঙ্গে স্নেহ—পড়াশুনো তারা মন দিয়েই করে। বিজয়া কিন্তু ভারি কড়া মাষ্টার!

•

শেষ-বর্ষার আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল। মেঘ হাল্কা হয়ে গেছে। শাদা শাদা ছোট ছোট মেঘগুলি নদীর জলের ওপর ছায়া ফেলে যায়। নীল আকাশের সঙ্গে সবুজ মাঠ কোলাকুলি করে। কাশের বন নেই, কিন্তু শিউলি ফুলের মুখচোরা গন্ধ চারিদিকে ভুর ভুর করে। নাথের পাহাড়, চণ্ডীর পাহাড়, চিত্রকূট—শিখিরে শিখিরে শাদা হয়ে যায়। মেঘের গর্জ্জনের সঙ্গে মাঝে মাঝে এক-এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে যায়, —আবার যেমন-কে-তেমন, শাদা মেঘের ফাঁকে নীল আকাশ রোদের আলোয় জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে।

সমস্ত দিনমানের একটি কর্ম্মহীন অলস মন্থরতা! দূরে শস্যশ্যামল মাঠের আধ-পাকা ধানের গন্ধ বাতাসে ভেসে ভেসে আসে। জান্‌লার পাশে ডালিমের ঝোপে মৌমাছির অশ্রান্ত গুন্‌গুন্ লেগে থাকে। সুমুখে চণ্ডীর পাহাড়ের গায়ে টিয়াপাখীর ঝাঁক্ চরে' বেড়ায়। পাহাড়ের নীচেই জামের বনে ক্লান্ত ঘুঘুর কণ্ঠ শোনা যায়!

—কেমন লাগ্‌ছে রে?

শীতলার প্রশ্নে সুলতা হঠাৎ থতিয়ে যায়।—

নারিকেল-পাতায় ছাওয়া ঘরখানি। ঘর ঠিক বলা চলে না, ভিতরে

প্রকাণ্ড একটা আড়ৎ। বড় বড় দুটো ধানের গোলা, তেল-ঘিয়ের কয়েকটা পিপে, কেরোসিনের কানেস্তারা, আলকাৎরার হাঁড়ি, রাজ-মিস্ত্রির সরঞ্জাম, পাট-তুলোর দুটো বস্তা, একরাশ পিতল-কাঁসার বাসন, দেয়ালের এক কোনে কতকগুলো কাঠ্‌রা এবং কিছু দড়ি, এপাশে স্তূপাকারে তরী-তরকারি, ফল-মূল, চন্দন কাঠ, কুশাসন,—এবং আরো অসংখ্য জিনিসপত্র! আড়াআড়ি খান তিনেক কাঠের চৌকীর ওপর গোটা-দশেক সেলাইয়ের কল! ঘরের মাঝামাঝি দু'তিনটে মাচা, তার ওপর বিছানা—একটাতে বোধ করি মিষ্টান্ন আছে, বোল্‌তা ঘুর ঘুর করছে! চালের বাতায় হরেক রকমের প্রয়োজনীয় ছোট ছোট জিনিস পত্র গোঁজা। তেল, ফিনাইল, চন্দন, ঝাল মসলা ও ফলমূল একত্রে মিশে একটি বিচিত্র গন্ধে এই প্রকাণ্ড আড়ৎ ঘরটি দিনরাত ভর্‌ ভর্‌ করছে!

এইখানেই একপাশে একটি জান্‌লার সুমুখে থাকে এরা দুজন। শীতলা এই ঘরের মালিক!

শীতলা বল্‌ল—চুপ করে' আছিস যে? মাঠ দেখলে মন হু হু করে নাকি?

কই, না ত!

শীতলা বল্‌ল—আমাকে ত ছাড়লিনে। কিন্তু আমি তোকে খুব ভাল ঘরেই রাখতে পারতাম। বাপরে, তুই আমার স্বামী হলেই হয়েছিল আর কি, এতদিনে হাঁপিয়ে উঠতাম! ভাগ্যিস!

সুলতা বোধ হয় একটু হাসবারই চেষ্টা করল।

অনেক ঘরোয়া কথাই শীতলা আজকাল তাকে বলে!

আচ্ছা, মা কি তোকে কিছু বলেছেন?

আমাকে? না ত' শীতলা-দি?

হুঁ!—বলে শীতলা খানিকক্ষণ চুপ করে' থাকে। তারপর হঠাৎ নিজের মনেই সে বলে' ওঠে—কি জানি বাপু, আমি অনেক জানি কিন্তু

এইটে ঠিক বুঝতে পারিনে। রূপের দিকে তাকালে মানুষের মনে যে কাঁটা ফোটে, এ কথা কে জানত' বল্ দেখি ভাই ?

সুলতা অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়।

কই মা ত' এমন ছিলেন না ?—অন্তরের গাম্ভীর্য্যটিকে চেপে রেখে শীতলা মুখে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে বলে—মা আমাদের দেখতে নিতান্ত মন্দ নয় কিন্তু, কি বলিস্ ?

সুলতা বলে—চমৎকার !

উত্তরটি ছিল একেবারে সুলতার জিহ্বাগ্রে ! প্রথমটা শীতলা একবারটি মুখের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে তার মাথাটি টেনে নিয়ে গালের ওপর একটি চুম্বন বসিয়ে দেয়। বলে—তোর গায়ে হাত দিলেই নিজেকে মেয়ে বলে আর মনে থাকে না ভাই।

যে-কথাটি সুলতা কিছুদিন থেকেই বল্‌বে বল্‌বে ভাবছিল, সেটি সে বলেই ফেলে—দিদি, মা যদি এমন রাগ করে' থাকেন তা হ'লে—

রাগ নয়, রাগ নয়—একে রাগ বলে না সুলতা ! মেয়ে হয়ে ত' বুঝিস্ মেয়েমানুষের এটা কোথায় লুকিয়ে থাকে। ওটাকে সন্ন্যাসের পালিশ দেওয়া যায় না, গেরুয়া দিয়ে ঢেকে রাখা চলে না, গীতার শ্লোক ওটার মুখ বন্ধ করতে পারে না ! হিংসেটা হিংসেই, রাগ নয় !

শীতলা উত্তেজনায় উঠে বসেছিল। অত্যন্ত স্পষ্ট করে' বল্‌ল—রূপের প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়াটা মেয়েরা কি সহ্য করতে পারে ?

ভীতকণ্ঠে সুলতা বল্‌ল—তুমি কি বলছ দিদি ? আমার দিকে হলে তুমি কি এখানে টেঁকতে পারবে ?

বয়সের একটি পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য শীতলার মুখে ফুঁটে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, এ যেন সে নয় ! এতদিনের ব্যঙ্গোজ্জ্বল বিদ্রূপাত্মক সহাস্য মাধুর্য্যময় মুখখানি অকস্মাৎ পাথরের মত কঠিন হয়ে আসে। চোখ দুটি স্পষ্ট, তীব্র, কণ্ঠে এতটুকু জড়তা নেই, অন্যায়কে মেনে নেবার মেয়ে

সে যেন নয়। বলে—ঈষৎ একটু সচেষ্ট হেসেই বলে—নিশ্চয়ই ! একটা টাকার মধ্যে অন্তত দশ আনা আমার পাওনা, মা একথা খুব ভাল করেই জানেন। তা ছাড়া যেটা পাবো সেটা আদায় করতে আমি যে ইস্পাতের মতন—একথা বুঝতেও আর কারো বাকি নেই ভাই !

কাজল-লতার অঞ্জন বোধ হয় শীতলার চোখেও লেগেছিল ! সন্ধ্যার ঝুপ্‌সি অন্ধকার একটু একটু ঘনিয়ে এসেছে। সারাদিনের একটা মোটামুট আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নিয়ে শীতলা একটু ব্যস্ত ছিল। সুলতার চোখে তখন অস্তাচলের চূড়ায় সন্ধ্যা-তারাটি জ্বল্ জ্বল্ করছে ! কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে' শীতলা এক সময় বল্‌ল—আজ যে শুক্ল পঞ্চমী, চাঁদের আলো দেখতে তোর না ভাল লাগে ?

সুলতা যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, কম্পিত দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল।

শীতলা বল্‌ল—রাজকুমারী ছাড়া আজ অন্ধকার ঘরের মধ্যে কে বসে থাকবে বল্‌তে পারিস ? ওই একটি মেয়ে ভাই আমাদের এখানে আছে, সমস্ত জীবন থেকে ওর গল্ গল্ করে শুধু বিষই উঠেছে। আর দেখগে যা অনিলাকে, নদীর ধারে বসে হাওয়ায় চুল উড়িয়ে দিয়ে এতক্ষণ সে হয়ত গান ধরেছে। লিখতে জানলে অনিলাকে নিয়ে কবিতা লিখতাম !

কথাটি বলে শীতলা নিজেই হাসল। বল্‌ল—তুই দেখছি ভিড় সইতে পারিসনে, নারে ? একজনের কাছে থাকতে পেলে আর একজনকে তোর মনেই থাকে না ! মুখপুড়ি, তুই কি আমার কাছা ধরেই দিন কাটাবি ? যা ওঠ্, পাহাড়ের ধারে খানিক রাত অবধি টহল্ দিয়ে আয়—যা।

সস্নেহ তিরস্কারটি সুলতাকে চৌকীর উপর থেকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। গায়ে চাদরটা মুড়ি দিয়ে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার সে ফিরে এলো।

কিরে, সাপে তাড়া করল নাকি?

সুলতা একবার দরজার দিকে একবার শীতলার দিকে তাকালো। মস্-মস্ করে' পায়ের শব্দ যাঁর হচ্ছিল, তিনি ভেতরে এসে ঢুকলেন।

বারে, দেবদত্ত যে! এমন অসময়ে?

পূর্ণ যৌবন প্রৌঢ়ত্বের দিকে হেল্‌তে আর বোধ হয় দেরী নেই। দোহারা গড়ন, গায়ে ছেঁড়া খাটো খদ্দর, মাথার চুলের মাঝখানে বড় একটা কাটার দাগ।

দেবদত্ত বল্‌ল—এ চলবে না, দারভাঙা থেকে যদি আনাতাম, তা হলেও সাতষট্টি আটষট্টি টাকার বেশী পড়তো না! ছিয়াত্তর টাকা যে এখানেই ঘিয়ের দর নেবে, এ লোকসান আমরা সইতে পারবো না!

শীতলা বল্‌ল—তবে কল্‌কাতায় যাও?

তা ত যেতেই হবে, কি মনে কর তুমি? আর দেখো না বসে বসে—সমস্তই এবার পাইকারী দরে কিন্‌ছি!

শীতলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সব তার কাণে যায় না।

আর শোনো এক কথা। সূতো কাটা মেয়েরা এত কমিয়ে দিল কেন? দিনরাত কেবলই বুঝি আড্ডা চল্‌ছে? একটু ধমকে দিতে পারো না? বুনোনের কাজ এবার কিছুই হয়নি। মাটীর পুতুলেও ভাল করে' রঙ্‌ চড়েনি। কাগজের ঠোঙ্গাগুলো সব ফুটো; পুঁথির মালার গেরোগুলো আল্‌গা! পয়সা দিয়ে যারা জিনিস কেনে তারা শুধু একবারই ঠকে! মেয়েদের তুমি একটু সাবধান করে দিও।

মুখের হাসি টিপে গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে শীতলা বল্‌ল—নিশ্চয় দেবো, এসব ভারি অন্যায়।

দেবদত্ত পকেটের ভেতর থেকে কতকগুলি কাগজপত্র বার করল। একটি একটি করে সেগুলি গুছিয়ে শীতলার হাতের কাছে ধরে বল্‌ল—মেহের কোম্পানীর তিরিশ টাকা জমা করে নাও, আর এই সূতো

বিক্রীর রসিদ,—মোটা সূতো, এবার সস্তায় দিতে হয়েছে! দুধের টিন টাকার ছটাক বেশী নামল না,—দুধে নাকি আঁকা গন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেবদত্ত একটির পর একটি হিসাব দিতে লাগল।

শীতলা তারপর জিজ্ঞাসা করল—এলে কখন?

অনেকক্ষণ?—গৌরী, পুষ্প, বুলু ওরা কেউ ছাড়ে না, বলে, 'চোর চোর' খেলায় বুড়ী হতে হবে! কি আর করি—মাঠের মাঝখানটিতে চুপচাপ বসে রইলাম! ময়দার মত সবাই ঠেসতে লাগল। ফেরবার সময় চাষীদের ছেলেমেয়েগুলো—একটা কাঁধে, একটা মাথায়, একটা আবার হাত ধরে ঝুলতে লাগল। জানই ত' ছেলেমেয়েগুলো আমায় পেলে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে!

আলোটা আড়াল করে দেবদত্ত দাঁড়িয়েছিল। তারই পিছন দিকে হঠাৎ আঙুল বাড়িয়ে শীতলা বল্ল—ওকে দেখেছ?

আত্মবিস্মৃত হয়ে এতক্ষণ দেবদত্ত কথাবার্ত্তা বলছিল, অন্ধকারে আর কেউ যে এমন নিঃশব্দে বসে থাকতে পারে, এ খেয়াল তার ছিল না। চট্ করে থেমে গিয়ে আলোটা ছেড়ে সে পিছন ফিরে তাকালো।

তাকালো সে নিতান্তই উদাসীন ভাবে। সপ্রতিভ এবং লাজুক দুটি বড় বড় হতচকিত দৃষ্টির সঙ্গে তার একবার চোখচোখি হ'ল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে শীতলার দিকে তাকিয়ে দেবদত্ত পুনরায় বলল—পাটনায় ব্যাঙ্ক বন্ধ, টাকা জমা নিল না। পোষ্টাফিসের হিসেবেই আপাতত রেখে এলাম!

বেশ করেছ। এখন থাকবে ক দিন?

দিন দুই। তারপর একবার গিয়ে আবার শীঘ্রই ফিরে আসবো।

দেবদত্ত ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শীতলা বল্ল—শোনো,

কথা আছে—বলতে বলতে সে উঠে তার পেছনে পেছনে বাইরে এল। সুলতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেবদত্ত স্বীকার করে' গেল না!

পঞ্চমীর চাঁদ তখন পশ্চিম-আকাশে নেমে গেছে। আশ্রমের পিছন দিকের অব্যবহৃত পথটি দিয়ে দুজনে চল্‌তে লাগল। এদিকটায় বিশেষ কেউ আসে না। পথটি এঁকে বেঁকে চিত্রকূটের নীচে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শীতলা তার হাতটি ধরে' বল্‌ল—আচ্ছা, দেবদত্ত?

দেবদত্ত মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটুখানি স্নিগ্ধ হাসী হেসে বল্‌ল—নামে ডাকলে উত্তর দেব না! তোমার দেওয়া নামে চলবো, আমার বুঝি নিজের নাম নেই?

আচ্ছা বেশ, না হয় আলোকনাথই হ'ল! আলোকনাথ প্রতিষ্ঠা না করা পর্য্যন্ত তোমার নাম যে আমার লুকিয়ে রাখবার ইচ্ছে! তোমার পূজো তাঁকেই দেবো!

লাভ?

লাভ নেই? সন্ন্যাসিনী সেজে অবৈধ প্রেমটাকে আগে থেকেই প্রকাশ করতে বল?

তা বটে!—দেবদত্ত হাস্‌ল। তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে' আবার চল্‌তে লাগল।

চারি দিকে জলা আর মাঠ। খাল বিল সব পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা রাতের হাওয়া হু হু করে' বয়ে' চলেছিল।

তারপর? মায়ের খবর কি বলত'? আজকাল কেমন?

শীতলা একটু হাসল। বল্‌ল—আগুন নিবে এসেছে, আর দু' এক বছর! দেহটাও প্রায় আল্‌গা হয়ে এল! কিন্তু একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি!

আলোকনাথ ঘাড় ফেরালো।

শীতলা বল্‌ল—সুলতাকে দেখে তাঁর মন আবার বিষিয়ে উঠেছে! সুন্দরী মেয়ের রূপ ওর চোখে আর সয় না। পড়্‌তি বয়সে অনেক জঞ্জালই মনে ঢোকে। আচ্ছা, একে কি হিংসে বলব আলোক?

নিশ্চয়ই! এ একেবারে দিবালোকের মতই স্পষ্ট!

অস্তগত ক্ষীণচন্দ্রের সামান্য একটুখানি আভাসে আকাশের অগণন নক্ষত্রবিন্দুগুলি জ্বল্‌জ্বল্‌ করে' জ্বলছিল। একটিবার সেই দিকে তাকিয়ে শীতলা বলল—এ আমি বুঝি না আলোক! ভালবেসে যাকে কোলে তুলে নিলাম, দুর্দ্দিনে যাকে আশ্রয় দিলাম, অন্নবস্ত্র দিয়ে যাকে রক্ষা করলাম, তার ওপর আমার এতখানি বিদ্বেষ মনে এল কি করে'? কোন্‌টা সত্যি বল ত? একই মানুষের ওপর এমন অপূর্ব্ব মমতা আর এমন জঘন্য বিদ্বেষ—একই মানুষের মনে জায়গা পেল' কি করে'?

শীতলার উষ্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে দেবদত্তের হাতটা বাঁধা ছিল। দেবদত্ত বল্‌ল—দুটোই সত্যি, মানুষের মন যে!

তবে কি তুমি বলতে চাও, মায়ের সাধনা মিথ্যে, ধর্ম্ম মিথ্যে, সন্ন্যাস মিথ্যে—মা আমাদের অসচ্চরিত্র?

তা বলি না! মানুষের পক্ষে সবই সত্যি! হিসেব করে' ত মানুষকে বোঝা যায় না!

কথা বলতে বলতে তারা অনেক দূর এসে পড়েছিল। খানাখোপ্‌রা উঁচু নীচ পার হয়ে দুজনে যে ভাবে চলেছিল, তাদের যে আবার ফিরতে হবে তা মনে হয় না।

আচ্ছা সুলতাকে ত তুমি দেখলে আলোক!

তা দেখলাম বৈকি!

কি মনে হলো?

তা কি করে' জান্‌বো? মনে আবার কি হবে? তোমার যত বেয়াড়া প্রশ্ন!

শীতলা সুন্দর একটুখানি হাসলো—না, এম্‌নি! অনেক মেয়েই ত তুমি দেখেছ, তাই ওর কথা জিজ্ঞেস কচ্ছিলাম। মেয়েটা মোটেই অসাধারণ নয়, বরং এতই সাধারণ যে সামান্য একটু গোলমাল হলেই চাপা পড়ে' যায়!

আলোকনাথ হেসে বলল—শিল্পীর ছবির মত আর কি! অনেক বাজে ছবির মধ্যে মিশিয়ে থাকে, একান্ত করে' দেখলে তবে রসগ্রহণ করা যায়!—কিন্তু আর কত ঘুরবে?

শীতলা বলল—তা হোক, চল! যতদূর পারবো চলবো তোমার সঙ্গে! অন্ধকারে বেশ লাগছে তোমার সঙ্গে চলতে! চলতে চলতে নিজেদের পায়ের শব্দ শুন্‌ছি, শিশির মেশানো হাওয়া গায়ে লাগছে— আহা, তুমি যদি স্ত্রীলোক হতে! স্থলতার পাশে বসে থাকলে এজন্যে আমার গা রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে! মাকে আমি এতকাল ছাড়তে পারিনি কেন জানো? চেয়ে দেখো ত'—আমাকে কি সত্যিই সন্যাসিনী বলে মনে হয়?

দেবদত্ত বহুদিনই তার কথা শুনে অবাক হয়েছে, আজও সে চুপ করে' রইল!—নারীসুলভ আত্মদানের কোমল দুর্ব্বলতা শীতলার মধ্যে ছিল না, তার ভিতর ছিল পুরুষোচিত দুর্ব্বার ভালবাসার বেগ!

ওটা কি দেখা যাচ্ছে বল ত? সেই ভাঙা মন্দিরটা নাকি?

হ্যাঁ!

দুজনে সেইদিকে এগিয়ে চলল।

অতি সন্তর্পণে পথ বাঁচিয়ে দুজনে এসে মন্দিরের চত্বরটার ওপর চেপে বস্‌ল—শীতলা বলল—গ্রামের আলো চিক্‌চিক্ করছে, মানুষের সাড়াশব্দ কিন্তু কোথাও নেই!

ভাঙা মন্দিরের ধ্বংশাবশেষের দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় বলল— কথা বলছ না যে আলোক?

দেবদত্ত বলল—তুমি স্ত্রীলোক হয়েও নিজেকে স্ত্রীলোক ব'লে স্বীকার করবে না,—কি কথা বলব? স্ত্রী-পুরুষ যে-কেউ তোমার কাছে এলে এই জন্যে বিপদে পড়ে।

শীতলা খিল খিল করে' হাসলো; কোনো উত্তর দিল না! হাসি থামলে বলল—আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালবাসতে পারতে?

তার মানে?

বড় বড় চোখ তুলে' শীতলা একটিবার মাত্র তাকালো। তারপর বলল— পায়ে এই মাটির দাগ, এই কাদার ছিটে. কপালে ঘামের ফোঁটা তুমি যত্ন করে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে?

দেবদত্ত বলল—আমাকে পর্য্যন্ত অপমান করছ? আমার কোঁচার খুঁটই আছে, আঁচল কোথা পাব?

শীতলা হা হা করে' হেসে উঠে দেবদত্তর পিঠ চাপড়ে দিল।

নিঃশব্দ রাত্রি চারিদিকে থম্ থম্ করছে। গ্রামের শেষে দীপশিখাটি পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। আকাশের তিন-তারাটি ঘুরে দক্ষিণ দিকে হেলে পড়েছে। চণ্ডীর পাহাড়ের ওধার থেকে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে আসছিল; বন্য কোনো জন্তুর চীৎকার কিংবা প্রকাণ্ড কোনো পাখীর কণ্ঠস্বর কিনা কে জানে! শীতলা বলল—সত্যি, আমার নিজের মনের ইচ্ছাটিকেও অদ্ভুত একটু প্রকাশ করতে দাও! ধর, দুপুর বেলায় রোদে দুজনে বেরিয়ে পড়েছি…হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে কোথায় যেন চললাম! ধর, ক্ষেতে আ'ল বেয়েই যাচ্ছি, আচ্ছা মনে কর ভুট্টার ক্ষেত। কিম্বা না হয়ত গভীর জঙ্গল, তারই কিনারা দিয়ে রাজপুত্তুর যেত ঘোড়ায় চড়ে'…আমরা দুজনে সেখান দিয়ে চলেছি, তোমার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখের তারায় ঘুমের মায়া জড়িয়েছে…আচ্ছা আলোক, তুমি যদি তখন বল, ওই শুক্‌নো কাশের জঙ্গলের মাঝখানে…কেউ দেখবে না…দুজনে শুয়ে শুয়ে পথশ্রম লাঘব করতে চাই…তুমি স্ত্রীলোক

হয়ে যদি বল, আমার কোলে মাথা দিয়ে বিশ্রাম চাও, যদি তোমার চোখে জল আসে, যদি জানি সারাজীবন তোমার একটি পুরুষের ভালবাসার অভাবে মিথ্যা হয়ে গেছে…একলা সেই মাঠে, কাশের সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে নারীর যা কিছু সব যদি তুমি চোখের জলে বিলিয়ে দাও—

উঠ্‌লাম ! অকারণে তুমি যে এমন চোখের জল ফেলবে তা আমার জানা ছিল না শীতলা ! আমি মেয়ে হলাম না কেন, আর তুমি কেন পুরুষ হলে না, এ নালিশের কোনো মানে আছে ? এসো উঠে এসো—ছিঃ ।

হাত ধরে' দেবদত্ত তাকে তুলে' আবার পথে নামিয়ে আন্‌ল। তারপর বল্‌ল—আশ্রমের মেয়েদের কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবার দরকার ছিল, কিন্তু আজ থাক্ ! এত রাতে দুজনে ফেরা…যদি কেউ দেখতে পায়…মেয়েরা কি মনে করবে বল ত' ? তোমার সঙ্গে পথে বেরোনোয় বিপদ আছে দেখছি, কখন্ মেয়েমানুষ বলে' হঠাৎ জড়িয়ে ধরবে তার ঠিক নেই !—এসো একটু পা চালিয়ে।

হাসির সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে শীতলা তার গলা জড়িয়ে ধরে চল্‌তে লাগল ।

বারো

শীতলার চরিত্র ছোট নয়—বিধাতা তাকে পৃথিবীর পটে বড় করে এঁকেছিলেন ? সে এসে সুমুখে দাঁড়ালে আর সবাই আড়ালে পড়ে' যায়।

—মাটীতে নুয়ে পড়েছিস তাই, মাথা উঁচু করে' না দাঁড়ালে তুই ত চলতে পারবিনে !

কাঁধের পাশে মুখ লুকিয়ে সুলতা বল্‌ল—তুমি আমার সবই শুনেছ দিদি, তোমার কাছে কিছুই লুকোই নি।

শীতলা বল্‌ল—পাপ যার মধ্যে নেই, দরকার হলে সে দুর্নীতি সবাই মাথা পেতে নেবে! তোর জীবনে কাঁটাও যত, ফুলও তত। বিধাতা তোকে অপমান করতে গিয়ে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন! তোর মতন দুশ্চরিত্র হওয়া মানুষের গৌরব। নারীত্বের সঙ্গে সতীত্বের যে কত বড় তফাৎ তা তোকে না দেখলে বুঝতামই না! কিন্তু ভাই, তোকে এমনভাবে দিন কাটাতে দেখলে আমি ত থাকতে পারবো না! এবার যে তোকে কাজের ভার নিতে হবে।

কি করতে হবে তুমি বলে' দাও দিদি।

শীতলা একটুখানি হাসল। বল্‌ল—এও ত পরের মুখ চাওয়া! কিন্তু এর থেকে তোকে আমি মুক্তি দেবো। মানুষ যখন কাজ খুঁজে পায় না, তখনই সে সকলের চেয়ে অসহায়! নিজেকে তুই ভাই এবার আবিষ্কার করে' নে!

শীতলা বল্‌ল—না ভাই না, চোখ মেলে আজ আর বাইরের মানুষের দিকে তাকালে চলবে না, নিজের ভেতরে এবার চোখ খুলে দিতে হবে। তোর মাটীর নীচে অনেক গুপ্তধন লুকিয়ে আছে তাদের খুঁড়ে বা'র করে' নে!

সন্ন্যাসিনী মা এসে ভেতরে ঢুকলেন। চেহারার মধ্যে তাঁর যেন কোথায় একটি পীড়াদায়ক পরিবর্ত্তন এসেছিল। কথাবার্ত্তা আজকাল তিনি খুবই অল্প বলেন।

বললেন—হিসেবে পাঁচখানা করে' মেয়েদের কাপড় বরাদ্দ ছিল, ছ'খানার হিসেব কে করলে শীতলা?

শীতলা বল্‌ল—ওটা হিসেবের ব্যাপার, হিসেব ত আপনি কোনোদিন দেখেন না মা?

মা গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—আশ্রমের হিতাহিতটা মধ্যে মধ্যে দেখা

উচিত না? মেয়েদের দিয়ে কাজ হবে অল্প অথচ ব্যয় হবে বেশী—এত' দেউলে হবার নিয়ম।

শীতলা হেসে বল্‌ল—আমার ওপর আপনার মেজাজটাও সুবিধে নয় দেখছি। কিন্তু মা, ব্যয় অল্প করে' এবং কাজ বেশী আদায় করে' যেটা হয় সেটা পাকা ব্যবসা-বুদ্ধি। তাই নিয়েই দেশ-বিদেশে যত অশান্তি!

মা বললেন—শীতলা, সাধারণ বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে আমি কম নই! কিন্তু এটা বোঝো ত' বুদ্ধিমান মেয়ে, ভিক্ষে করে' মানুষের সেবার সৌখীন মহত্ত্ব দেখাতে গেলেও একটি শৃঙ্খলা থাকা দরকার? হিসেবটা থাকলেই সব জিনিসের ছন্দ থাকে, নৈলে সবই ছন্নছাড়া!

শেষ কথাগুলির মধ্যে মায়ের মুখ থেকে যে উত্তাপটুকু বেরিয়ে এল, শীতলা তাতে আবার একটু হাসল। হেসে বল্‌ল—কিন্তু মা, হিসেব কষ্‌তে কষ্‌তে দরকারের ল্যাজা-মুড়ো যদি বাদ যেতে থাকে তা হলে মেয়েরা যে বড় কষ্ট পাবে! না খেয়ে চলে কিন্তু মেয়েদের আব্‌রু না রাখলে যে চলে না মা?

কথাগুলি শুনে মা একটু থম্‌কে দাঁড়ালেন, তারপর চলে যাবার আগে বেশ একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে গেলেন—তোমাকে নইলে আমার চলবে না তাই জেনেই তুমি যখন তখন আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসো শীতলা! তবুও বলে যাই, যে-মেয়ে কোনো কাজই করে না, এতটুকু বুদ্ধি শুদ্ধি যার নেই, তাকে ভাত-কাপড় দিয়ে বসিয়ে বসিয়ে পোষবার শক্তি আশ্রমের ফুরিয়ে গেছে!

শীতলার মুখখানা অপমান-বোধে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। একবার সে কাঠের মত স্থলতার মূর্ত্তির প্রতি তাকালো, পরে গলা বাড়িয়ে মায়ের পথের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনিও তাহলে কোশাকুশি গীতাপাঠ ছেড়ে এসে তাঁতের মাকু চালাচালি করুন।

মা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—কি বল্‌চ ?

শীতলা বল্‌ল—বলছি যে, আমি আর আপনি কর্ত্তৃত্বের ভার নিয়ে থাকবো, আর সবাই আমাদের পায়ের তলায় পড়ে' খেটে খেটে মরবে তা ত' হতে পারে না ! আজ থেকে সবাই সমান হোক।

মা মুখ রাঙা ক'রে চলে গেলেন।

দুইটি ডানা দিয়ে শীতলা বাইরের ঝড়-ঝাপ্‌টা থেকে সুলতাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করল।

অনেক সময় এমন দেখা গেছে, সুলতা অলক্ষ্যে শীতলার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে-মুখে কোথায় যেন একটি নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার ও প্রশান্ত জীবনের ছাপ রয়েছে। গায়ের রংটা তার রোদে পোড়া, মেটে, বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখলে চক্‌চকে তামার একটি আদল্‌ আসে। আশ্রমের অনেক মেয়ে এদের দুজনের সম্বন্ধে কানাকানি ক'রে বসে—গঙ্গা-যমুনা এক জায়গায় এসে মিশেছে।

শীতলা যেন আঙুরের মত সকল সময়েই টস্‌টস্‌ করে। হাসতে হাসতে বলে—প্রথমে মনে হয়নি, না রে ? আমাকে এমন পাথরের মতন কঠিন করে' কখনো ভেবেছিলি ?

ঘাড় নেড়ে সুলতা জানায়, না !

শীতলা বলল—কিন্তু আমার চেয়েও নিষ্ঠুর আর একজন আছে, সুলু ! বুক ভেঙেছে তার বহুবার, কিন্তু এতটুকু টসকায়নি। অপমান তার গলায় সত্যিই বরমালা পরিয়েছে, আঘাত হয়েছে তার অঙ্গের অলঙ্কার অন্যায় অত্যাচারকে সে করেছে বিভুতি,—সুলতা আমরা যদি নদী হই সে তবে সাগর।

সুলতা নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল। চোখের কোলে তন্দ্রাজড়িত একটি ঈষৎ জলরেখা নিয়ে শীতলা জান্‌লার বাইরে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি মেলে উদাসীন কণ্ঠে বলল—প্রথম জীবনে দুঃখকে সে হাসিমুখে

বরণ করতে পারেনি, ব্যথার দায়ে বহুবার সে আত্মহত্যা করেছে, অকারণ অপবাদ আর লাঞ্ছনাকে সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেনি, বুকভরা বেদনা নিয়ে অনেকবার সে ঘরছাড়া হয়ে চলে গেছে।

তিনি কে দিদি?

শীতলা ঘাড় ফিরিয়ে একটুখানি হাসল। বল্‌ল—হ্যাঁ, তাকে আঙ্গুল বাড়িয়ে চিনিয়েই দিতে হয় বটে! দুঃখকে সে যে অঞ্জলি ভরে পান করেছে, বেদনায় যে তার দুকূল ছাপাছাপি, তাকে দেখে একথা কিছুতেই বোঝবার যো নেই! স্থলতা, বিজ্ঞাপন দিয়ে সে নিজেকে জাহির করে না, 'ব্যথার' পরিচয়পত্র কপালে এঁটে সে জীবন-স্মৃতির ফিরি করে বেড়ায় না! আর তার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান?—একটু হেসে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সে আবার বল্‌ল—বোঝাতে তোকে পারব না স্থলতা, যেখানেই তাকে প্রশংসা করতে যাবো সেখানেই সে ছোট হয়ে যাবে।

কোথায় থাকেন তিনি দিদি?

শীতলা আবার হাসল—আজ অবধি বুঝতে পারিনি। রহস্যময় সে মোটেই নয়! মানুষের অতি কাছেই তার বাস। তবু ভাই কেবলি যেন মনে হয় তার ধরা ছোঁয়া পাইনে! ধরে বেঁধে তাকে দেখতে গেলেই সে আল্‌গা হয়ে যায়। সত্যি সত্যি, কোথায় গেলে যে তাকে পাবো আজ অবধি তার হদিস পেলাম না!

বাইরে ছোট ছোট মেয়েরা তখন ভিড় করে' পড়তে এসেছে! তাদের কলরব শুনে উঠে যাবার আগে শীতলা বল্‌ল—তার কথা গানের মত, গাইতে গাইতে আমার নিজেরই নেশা ধরে যায়!

যে মানুষটির সম্বন্ধে এত কথা হল—সে যেন একটি রসমূর্ত্তি নিয়ে স্থলতার চোখের সুমুখে এসে দাঁড়াল! কিন্তু হায় রে, সে মেয়ে কি

পুরুষ এই আসল কথাটাই যে জানা হল না! পুরুষ বলে' সুলতা তাকে একবার কল্পনা করল! যে-রূপটি শীতলা তার কাছে প্রকাশ করল, উপেনের সঙ্গে তার অনেকখানি যেন মেলে!

হ্যাঁ, উপেনের কথা সে ভুলতে পারবে না বটে! উপেন একদিন তার সমস্ত দৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন করেছিল! শীতলা-দির দেখা পাবার ঠিক আগেই আর কি!

আর সে যদি নারী হয়!

কিন্তু শীতলাকে পার হয়ে আর কোনো আদর্শ নারীই তার দৃষ্টিতে এল না! মা? ন্-নাঃ!

দুপুর বেলা সুলতা শীতলার দপ্তরে বসে' কাজ করছে,—অঙ্ক কস্‌লে নাকি মাথা পরিষ্কার হয়,—শীতলা-দি বলে!

দেবদত্ত এসে ঘরে ঢুকল! জড়সড় হয়ে সুলতা উঠে চৌকীতে গিয়ে বস্‌ল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে খাতা দেখে সে দু'য়ে আর দু'য়ে চার মেলাতে লাগ্‌ল।

জিনিসপত্রে ভাঁড়ারে রসদে ঠাসা আড়ৎ ঘরটি ছাড়া আর কোথাও জায়গা ছিল না। মেঝের ওপর মাদুর বিছানো রয়েছে। দেবদত্ত তার ওপর বসে' পড়ে' টাকা কড়ি কাগজপত্র বা'র করে' রাখতে লাগল। ছ'টাকা দশ আনা থেকে পাঁচ টাকা তেরো আনা বাদ দিতে সুলতা তখন আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

দেবদত্ত নিজের মনেই বল্‌ল—শরতের মাঝামাঝি, তবু এত গরম। একটু আগে বিষ্টি হয়ে গেল, তবু ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছি এইটুকু মাঠ পার হতে গিয়ে!

বাঁ-হাতের আঙুলের করের উপর সুলতার বুড়ো আঙুলের গোণাগণি চল্‌ছিল—ঠিক সেই গোণার ভঙ্গীতেই তার আঙুলগুলি হঠাৎ থেমে গেল! নিশ্বাস ফেলেই তার মনে হলো, আহা! ঘাম হবে না

অত পরিশ্রম করলে? তা ছাড়া যে রোদ্দুর! হাতপাখা থাকলে সে নিশ্চয়ই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিত!

দেবদত্ত কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ করল না। মুখ তুলে বিরস এবং অতি সাধারণ কণ্ঠে বল্‌ল—শীতলা কোথায়?

ঘাড় আর সুলতা সেদিকে ফেরাতে পারল না! সলজ্জ ভাবে বল্‌ল—মেয়েদের পড়াতে গেছেন।

ও, একটু দরকার ছিল। আচ্ছা না হয় ত অন্য সময়ে—না না, উঠতে হবে না, এমন কিছু বিশেষ,—হিসেব মেলানোর চেয়ে পড়ানোটা বেশী দরকারী।

তা ত বটেই। সুলতার এই সামান্য কথাটায় খেয়াল ছিল না? গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে করতে এক সময় ঘাড় তুলে দেবদত্ত বল্‌ল—তিন-তিরিক্ষে নয় আর চারে তেরো, আর পাঁচে? আঠারো—কেমন? আচ্ছা, আঠারো আর তেরোয়? আঠারো আর তেরোয়, কত?—সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে গোণ্‌বার চেষ্টা করল।

মনে মনে হিসেব করে' সুলতা হঠাৎ বল্‌ল—একতিরিশ!

বেশ! একতিরিশের এক—বলে' দেবদত্ত পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর লিখলো—হাতে থাকে তিন!

সুলতা আবার ভাবতে বসলো, দশ আনা থেকে তেরো আনা কেমন ক'রে বাদ দেওয়া চলে।

দেবদত্ত নিজের মনেই বল্‌ল—তিন চারে বারো, তিন পাঁচ পনেরো, তিন সাতে একুশ, তিন-এগারো—তিন-এগারো কত হল?

সুলতা বল্‌ল—তেইশ!

সোৎসাহ আনন্দে দেবদত্ত বল্‌ল—আমার মাথা!

কানের ডগা পর্য্যন্ত সুলতার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

হাসতে হাসতে দেবদত্ত বল্‌ল—আপ্‌—তুমি ভারি বেহিসেবী ?

তা বটে ! তেইশের জায়গায় তেত্রিশ বললেই ত সব গোল মিটে যেত ? কিন্তু দশ আনা থেকে তেরো আনা বাদ দেওয়া বড় কঠিন।

নাম কি ?—দেবদত্ত জিজ্ঞাসা করল।

সুলতা !

সু, ল আবার তা ? সু-য়ের মুড়ো চিবিয়ে লতা কেমন মানায় ?

উত্তর দেবার আগে মা এসে ঢুকলেন। রাঙা গেরুয়ায় মা যেন জ্বল্‌ছেন। তপঃক্লিষ্টা নারীটির মুখে যে ভাবটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে সেটি ঠিক আশ্রমের উপযোগী নয়। দুটি নর-নারীকে একা এখানে থাকতে দেখে তাঁর একেবারেই ভাল লাগ্‌ল না। তাছাড়া কয়েক দিন থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে দু'তিনটি মানুষের কেমন যেন একটি চক্রান্ত চল্‌ছে। কণ্ঠের কটুত্ব যথাসম্ভব গোপন করে' তিনি বললেন—সেই ক্ষীণ মিহি কণ্ঠই তাঁর শোনা গেল—দেবদত্ত, তুমি বোধ হয় শীতলার মতামতকে শিরোধার্য্য করনি ?

সে কি ! কি বলছেন ? শীতলার মুখ থেকে আমি ত সব শুনেছি মা ?

তা আগেই আমার মনে হয়েছে। আমাকে যখন সবাই জানে তখন আমার মতামতটা জেনে নিতেই বা দোষ কি ! তোমার ওপর আমি একটি ভার দিতে চাই দেবদত্ত ? অক্ষম মেয়েগুলোর ভার তুমি নেবে ?

এ ত' বুঝতে পারবার মতন কথা নয় মা ?—দেবদত্ত একটু হাসল।

অলক্ষ্যে একবার গম্ভীর দৃষ্টিতে মা সুলতার দিকে তাকালেন। স্নেহের চেয়ে একটি সুদূর ঔদাসীন্য সে-দৃষ্টিতে মাখানো। সে-দৃষ্টি নিষ্ঠুরের মত সবাইকে শরবিদ্ধ করে। সুলতা ভয়-ব্যাকুল হয়ে মাথা হেঁট করল।

মা বললেন—বুঝতে পারা অতি সহজ দেবদত্ত, আশ্রম যে-মেয়ের ভার নেবে, আশ্রমের ভারও যে তাকে কিছু নিতে হবে !

দেবদত্ত খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে' রইল। মা পুনরায় বললেন—শীতলা আমাকে ভুল বুঝেচে,—সে অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হোক কিন্তু অন্ধ না হয়! মনকে কঠিন করে' না বাঁধলে কোনো বড় কাজে শৃঙ্খলা রাখা যায় না—এ আমি বিশ্বাস করি দেবদত্ত! আশ্রমের যারা বোঝা হয়ে থাকবে তারা পথ দেখুক, এই আমি শীতলাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম! তুমি এ-ভার নিতে পারবে?

মা যে সুলতাকে দৃষ্টি বহির্ভূত করতে চান্, একথা দেবদত্ত বুঝল। সুলতার রূপ তিনি সহ্য করতে পারেন না, সুলতার অবস্থান তাঁকে পীড়া দেয়, সুলতার অস্তিত্ব তাঁকে অস্থির করে' তুলেছে। সুলতা তাঁর চক্ষুশূল!

দেবদত্ত বল্ল—দিনকতক সময় দিন্ আমাকে।

মা রাজী হলেন—তারপর এদিকে ফিরে স্পষ্ট উদ্দীপ্ত কণ্ঠেই বললেন—এখানে তোমার কি কাজ হচ্ছিল সুলতা?

সুলতা কেঁপে উঠল। মা বল্‌লেন—অন্যের কাজ পণ্ড করায় বাহাদুরী নেই। যে বস্তুটার সুবিধে তুমি নাও সেটার থেকে এখানকার মেয়ে-পুরুষ অনেক দূরে থাকে। লজ্জার সীমা এড়িয়ে যাওয়া মেয়েদের পক্ষে অপমানের কথা। শীতলার ধাতু সব মেয়ের নেই। কাজকর্ম্মের সময় একটু আড়ালে সরে' যেতে হয়। বুঝলে?

সুলতা আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে চলে' গেল।

বাইরের মাঠে তখন উষ্ণ জলো হাওয়া হু হু করে' বয়ে চলেছে। আকাশ একেবারে গাঢ় নীল, সূর্য্যের আলোয় ধব্‌ধবে শাদা লঘু মেঘের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝরা শিউলি ফুলের শুক্‌নো মিষ্ট গন্ধ এত রোদেও ভুর্ ভুর্ কচ্ছিল।

জীবনে আজ প্রথম সুলতা অপমান বোধ করল। অপরাধ সে কিছুই করেনি, অপমান তাই তার বুকে বড় বাজ্‌ল। দেবীর আসনে

যাকে প্রতিষ্ঠা করে' প্রতিমার মত সে পূজা করেছিল, আজ সেই প্রতিমা খড়্গের আঘাতে তার কণ্ঠনালী ছেদন করলেন !

কিছুদূর গিয়ে মাঠের মাঝখানে সে এক জায়গায় চুপ করে' বসল। ঘাসের ডগায় ছোট ছোট শাদা শাদা ফুল ধরেছে। টুক্‌রো বাতাসের ছোঁয়ায় সেগুলির মাথা দুল্‌ছে। চারিদিকের পাহাড় আর অবারিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার বাল্য জীবনের কথা মনে পড়ল। সে-জীবন তার আনন্দময় ছিল, আর একবার কি সে-জীবনে ফিরে পাওয়া যায় না ! মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল পূর্ব্ব-জীবনের সেই সুন্দর দিনগুলির মালা গেঁথে আর একবার কি সে গলায় পরতে পারে না ? আজ সুলতা আর চোখের জল ফেল্‌ল না—আপনাকে বুঝতে পেরে চোখের জল তার শুকিয়ে গেল ! এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা যার নেই, সংসারে যার কোনো দাবীই নেই—ভেসে ত তাকে চলতেই হবে ! কিন্তু বাঁচবার অধিকার তারও ত কিছু আছে ! সম্বল জীবনে হয়ত তার কিছুই নেই কিন্তু পৃথিবীর এই আলো-হাওয়া, এই মাঠ, ওপরে ওই আকাশ, তার নীচে অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী ধরণী—এর থেকে মানুষ তাকে উচ্ছেদ করতে চায় কোন্ অপরাধে ? কোন্ অপরাধে তার এ অপমান !

সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার ভাল করে' পরীক্ষা করে' নিল। হৃদয়ের বন্ধ দ্বারগুলি তার যেন আর খুলতেই চায় না, কপাটে কপাটে যেন মর্‌চে পড়ে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে মাঠেই সে খানিকক্ষণ পায়চারী করে' বেড়াল। বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকে সে একবার স্পষ্ট ক'রে দৃষ্টি মেলে তাকালো। সবুজ মাঠের কোলে ঘন জঙ্গল ক্রমে উঁচু হয়ে একেবারে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। আকাশকে আকাশ ছাড়া আজ তার আর কিছুই মনে হল না। নীচে নদী বয়ে' চলেছে—আজ বহুদিন পরে বিদেশী একখানা জেলেডিঙিকে ভাসতে দেখা যাচ্ছে। একটু আগে এক পসারিনী ওপারের বালুচড়া থেকে এক মোট বালি

তুলে নিয়ে চলে গেছে। যা সহজ, যা স্পষ্ট, যা সত্য—আজ সুলতার চোখে কেমন করে' না-জানি একান্ত ভাবেই ধরা দিল। যেন একটি আত্ম-বিশ্লেষণের শক্তি আয়ত্ত করেছে।

খাতা পত্র হাতে নিয়ে দেবদত্ত চলেছিল মাঠ পার হয়ে। সুলতা তাকে দেখে একটু চকিত হয়ে থেমে গেল। যেতে যেতে দূর থেকে হাত বাড়িয়ে দেবদত্ত তাকে একবার ডাক্‌ল।

সুলতা কাছে এসে নতমস্তকে দাঁড়াতেই দেবদত্ত বল্‌ল—তুমি কি মায়ের ওপর কোনো অন্যায় করেছিলে?

মাথা উঁচু করে' সুলতা বল্‌ল—না।

কিন্তু উনি যদি তোমার ওপর শত্রুতা করেন, তাহলে কোথায় যাবে তুমি?

সে কি উনি পারবেন করতে?

সব জিনিসের জন্যই তৈরী হয়ে থাকা ভাল। শীতলার মুখে তোমার সবই শুনেছি।—বলতে বলতেই দেবদত্ত হাসতে লাগল—এ রাজত্বটা আমাদের নয়—মায়ের! মেয়েদের মধ্যে তোমার যে-বদ্‌নাম রটে গেছে, সে-দোষ মেয়েদের নয়, সাম্রাজ্য চালাতে গেলে একটা রাজনীতি দরকার—এখানে সে রাজনীতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ দিয়ে তৈরী! তাছাড়া ব্যবসা-বুদ্ধি এখানে এতই প্রবল যে, স্বেচ্ছাতন্ত্র না চালিয়ে উপায় নেই! তোমাকে কাজ করতে বলা হচ্ছে, কিন্তু কাজ না দিয়ে উল্টে তোমার কপালে দাগ দিয়ে কিসে তাড়ানো যায়, সে ব্যবস্থাও চলেছে!—

দেবদত্তর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল।

সুলতা বল্‌ল—আপনি এখানে থাকেন কেমন করে'?

দেবদত্ত বল্‌ল—থাকিনে মোটেই, অনেক দিন থেকে শীতলার সঙ্গে আমার আলাপ, তাকে আমি ভালবাসি, মাঝে মাঝে তাই দেখাশুনা

করতে আসি। কিন্তু অমনি আসিনে, সন্ন্যাসিনীর কাজও কিছু করে' দিই। কাজ কিছুই না করে' শুধু যদি শীতলার বন্ধু হতাম তা হলে এতদিন দুশ্চরিত্র বলে আমার কলঙ্ক রটতো। আর সে কলঙ্ক আমার পক্ষে হতো ভারি স্বাভাবিক। এসো, আমরা এখানে একটু বেড়াই, শীতলা আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে!

চলতে চলতে সুলতা বল্‌ল—আপনি থাকেন কত দূরে?

দেবদত্ত শিশুর স্নিগ্ধ হাসি হেসে বল্‌ল—বহুদূর রহস্যপুরে নয়, খুবই কাছাকাছি। হাত বাড়ালেই আমাকে পাওয়া যায়।

উভয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলতে লাগল। দেবদত্ত মুখ ফিরিয়ে এক সময় বল্‌ল—যতদূর শুনলাম, তোমার মুখের ওপর সকল দরজা বন্ধ হয়ে গেছে! কিন্তু তা হোক, স্থান করে' না নিলে স্থান কেউ দেবে না, এই হচ্ছে নিয়ম। মায়ের গোপন প্রবৃত্তি তোমাকে এখান থেকে একদিন কিন্তু সরিয়ে দেবেই।

সুলতা বল্‌ল—শীতলা-দিকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না!

অপমান করলেও না?

সুলতা বড় বড় দৃষ্টি মেলে বল্‌ল—অপমান আমার সওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে দেবদত্তবাবু।

একটুখানি হেসে দেবদত্ত আবার বলল—অর্থাৎ এই তোমার শেষ আশ্রয়! কিন্তু না, এ তোমার ছেলে মানুষী! অপমান সয়ে' টিকে থাকা চলে, বাঁচা চলে না! সকলের অপমান সইবার যে-শক্তি তা সবার নেই! বরং আঘাত সইতে পারো অপমান নয়!

সুলতার চোখে কে যেন জ্যোতির্লেখায় এই কথাগুলি লিখে দিয়ে গেল। এ বাণীর প্রয়োজন তার জীবনে ছিল,—আশীর্ব্বাদের এ-আভাস সে মাথা পেতে নিল। কণ্ঠে তার কান্না এল না, কিন্তু বুকে এল আবেগ।

নিজের কাছে নিজেকে পরিচিত করে' দেবার এই যে ইঙ্গিত—দেবদত্তর কাছে আপনাকে সে ধন্য মনে করল।

সে বল্‌ল—শীতলা-দি সেদিন কি আপনারই কথা বলেছিলেন ?

দেবদত্ত বলল—হতে পারে কিন্তু এও বলে রাখি, আমার সমস্ত জীবনের ইতিহাস হয়ত লাঞ্ছনা, বেদনা ও দুঃখের কাহিনীতে ভরা, কিন্তু তা' বলে তার জন্যে আমার কোনো গৌরব নেই। আমার তপস্যা এগিয়ে যাবার। বিপথে নয়' পথ থেকে পথে। সে-পথ অন্ধকার, তাই যাবো আলো জ্বেলে জ্বেলে।

কম্পিত কণ্ঠে সুলতা বল্‌ল—সে পথ কি আপনার চেনা ?

না, চেনাও নয় জানাও নয়—চলতে হবে নিজেরই সাধনায়—দেবদত্ত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌ল—অল্প থেকে সে বৃহৎ হয়ে গেছে, সঙ্কীর্ণ থেকে হয়েছে বিস্তৃত! ছোট লোকালয়ের পাশ থেকে সে সরু পথটি চলে গিয়ে পৃথিবীর সকল পথের সঙ্গে মিশে গেছে! এত' আমার স্বপ্ন নয়, কবি-কল্পনাও নয়—জীবন আমাকে এই পথে যাবার কথাই কেবল বলছে।

অত্যুগ্র আবেগের নেশায় সুলতা থর থর করে কাঁপছিল। দেবদত্ত বলল—নিজেই যে পথ হাঁতড়াই, অন্যকে তার সন্ধান দেবার সাহস আমার নেই। গোড়ায় ছিল নতুন পৃথিবী তৈরী করার বাসনা, গোড়ায় সবারই তাই থাকে—কিন্তু আর না, রূপের প্রতিপত্তি নষ্ট হবার ভয়ে সন্যাসিনিকেও যখন দেখলাম, গায়ের চামড়ার প্রতি ঈর্ষা পার হতে পারল না, প্রকৃতির কাছে তখন হার মেনে গেলাম। থাকুক্ নতুন পৃথিবী! যে-পথ জগতকে ছাড়িয়ে বিশ্বের দিকে মিলিয়ে গেছে, এই জীবনে সেই পথেই পৃথিবীকে পার হয়ে যেতে হবে। আকাশ পথে উড়ে যাওয়াই মর্ত্যবাসীর সাধনা হোক্।

সুলতা বলল—আমার তবে কোথায় জায়গা হবে বলে দিন্?

দেবদত্ত সস্নেহ মমতাময় হাসি হাসল,—জ্যোতিষী হলে বলতাম। কিন্তু জায়গা তোমার কোথায় নেই সুলতা! শীতলা তোমার প্রসঙ্গে বলছিল, স্রোতে-ভাসা! তাই হোক স্রোতে ভেসে ভেসে গিয়ে তুমি সাগরে অদৃশ্য হয়ে যাও, এই কামনাই করি! কামনা করি, এবার তোমার জীবনে অতৃপ্তি আসুক, তৃষ্ণা হোক দীর্ঘতর, আরাম থাক্ দূরে, পায়ের তলার পথ হোক কণ্টকিত—তবেই মিলবে শক্তির সন্ধান, বিধাতার সঙ্গে হবে বন্ধুত্ব!—ওই যে, শীতলা হাসতে হাসতে আসছে আমাদের দিকে!

সুলতা তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে দেবদত্তর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে' নিল।

তেরো

শীতলা এল হাসতে হাসতে। এ হাসিটি তারই একার, এর নকল আর কারো মুখে ফোটে না। এই অতি-পরিচিত হাসিটির সঙ্গে তার অন্তরের রূপটি সুন্দর হয়ে ভেসে ওঠে।

বলল—পায়ের ধুলো মাথায় নেবার পালা ত শেষ হলো দেখলাম, আশীর্ব্বাদটা কি হলো শুনি?

দেবদত্ত বলল—আশীর্ব্বাদের ভারটা তোমার ওপর।

শীতলার মুখ আজ আর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো না। শক্তির স্ফুরণ যখন হয়, মাথা তখন আপনিই উঁচু হয়ে ওঠে। দেবদত্তর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে যে-কথাটা আজ পর্য্যন্ত কোনোদিন সে বলতে পারেনি সেই কথাটি স্পষ্ট করে' বলল—নিজেকে নষ্ট করতে বসেছিলাম দিদি, আর নয়। অনেক কাজই বাকী আছে, চুপ করে' আর আমার বসে থাকলে চলবে না!

শীতলা তার মুখের দিকে মুখ ফেরালো। ধোঁয়া ছাড়া যেখানে আর বিশেষ কিছুই দেখা যেত না, আজ সেখানে হঠাৎ উজ্জ্বল-অগ্নিশিখার

সন্ধান পেয়ে সে কিয়ৎক্ষণ অবাক হয়ে রইল। তারপর বলল—কাল পর্য্যন্ত এ ঝাঁঝ্ থাকবে ?

ঝাঁঝ্ নয় দিদি !—সুলতা দেবদত্তর দিকে একবার তাকিয়ে বলল—সবাই আমাকে ঘা মেরে তৈরী করেছে, অপমানের পরে অপমানে নিজের পথ আমি চিন্‌তে পেরেছি !

শীতলা একটু হেসে বলল—বুঝলাম ! আয় তবে আশ্রমে, থাক্ এখানে,—কাজই যদি করবি, আয় তবে আমি সব ব্যবস্থা করে' দেবো।

দেবদত্ত বিজ্ঞের ভাণ ক'রে বলল—মন্দ প্রস্তাব নয় !

সুলতা দুজনের কথারই স্পষ্ট জবাব দিল—না, এখানে আমার জায়গা আর নেই !

শীতলা বলল—আমি যদি করে দিই !

না দিদি।—মাথা হেঁট করে' বিনীত কণ্ঠে সুলতা আবার বলল—মায়ের কাছে আমার থাকা আর চলবে না।

দেবদত্ত একটুখানি স'রে দাঁড়িয়েছিল। শীতলা তার সঙ্গে চোখ-চোখি করে হাসতে লাগল। তারপর বলল—বেশ এও বুঝলাম, কিন্তু আমার কথা কি ভাবচিস্ ভাই ?

সুলতা বলল—সে ত' বলেই রেখেছি। তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো দিদি।

বাপ্‌রে তাই নাকি ? কোথায় যাবি ?

না দিদি, ঠাট্টা নয়। দুজনে আমরা যাবো সহরে, অনেক মানুষ যেখানে...অনেক গোলমাল, গাড়ী ঘোড়ার আওয়াজে কান পাতা যায় না···মানুষ যেখানে পরিশ্রম করে খায়, ভিক্ষে করে, আমরা সেখানে যাবো দিদি। সকলের মধ্যে মিশে থাকবো,...সকলের দুঃখ ব্যথা আর আনন্দের ভাগী হয়ে পথের ধারে আমাদের দিন কাটবে।

কি কাজ করবি ? মাষ্টারী, না চরকা কাটা ?

যা পাবো তাই। কোনো বাচ-বিচার থাকবে না দিদি। সহরের মাটি বিক্রী করলেও দিন চলে, তাই না-হয় কোরবো। কিছু না হয়, কোনো বড় মানুষের বাড়ী ঢুকে তাদের ছেলে মানুষ করার কাজও জুটবে!

সুলতাকে কাছে টেনে নিয়ে শীতলা চুম্বন করল। বলল—এ যেন কেবল তোর মুখের কথা না হয়!—দেবদত্ত, তুমি যে হঠাৎ উদাসীন হয়ে গেলে?

দেবদত্ত বলল—ভাবচি মেয়েরা তাহলে সত্যিই একদিন স্বাধীন হবে।

শীতলা খিল খিল করে হেসে উঠল।

মাঠের ওপর অপরাহ্ন নেমে এসেছিল। এই মাত্র দূরে কোথায় ট্রেণের একটি বাঁশীর আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সুলতা চললো মাঠ পার হয়ে।

কিয়দ্দূর সে এগিয়ে যাবার পর দেবদত্ত বলল—আচ্ছা শীতলা, তোমাদের আশ্রমে অক্ষম মেয়ের সংখ্যা কত?

একটিও নেই।

মা'র কাছে সময় নিয়েছি, নিষ্কর্ম্মা মেয়েগুলোকে আমায় পুষতে হবে।

নতুন বটে! জীবনে তোমার এই কাজটিই বাকী ছিল! তোমার ভার কে নেবে শুনি।—একবার দেখো দেখি মুখ ফিরিয়ে ওদিকে? দেখো দেখো—

সুলতা ততক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে। দু জনেই কপালে হাত দিয়ে সূর্য্যের আলো আড়াল করে সেই দিকে তাকালো।

শীতলা বলল—হাঁটতে শিখেছে, নয়?

হুঁ, তোমার সংস্পর্শ মিথ্যে হয় নি।

শীতলা হেসে বলল—ছিঃ মুখের ওপর এ রকম প্রশংশা নাই বা করলে?

প্রশংসাটা সুমুখে শোনাই ভাল, আড়ালের প্রশংসায় অনেক গলদ থাকে। যাই হোক্, তুমি তাহলে চললে সুলতার সঙ্গে?

একটু হেসে শীতলা বলল—পাগল! মাকে ছেড়ে যাবো কোথায়?

তার মানে? তা হলে সুলতা—

শীতলা আবার হাসল। বলল—সুলতা নিজেকে চিন্‌তে পেরেছে, তার আর ভয় নেই; কিন্তু মাকে ছাড়লে মার যে চলবে না আলোক। আমি যে তাঁকে নিখুঁৎ করবার ভার নিয়েছি, তাঁর যত গ্লানি যত গলদ আমি ছাড়া আর বইবে কে?

শেষের কথায় তার কণ্ঠে বাজল কারুণ্য!

দেবদত্ত বলল—সুলতা যখন এল আমাদের মধ্যে তখন ওকে একলা ছেড়ে দেওয়াও কঠিন। উত্তেজনার পরে যে অবসাদ তার চেহারা ভাল নয়। এই আবেগ যখন ওর চোখ থেকে মুছে যাবে তখন সে চোখ হবে অন্ধকার। সুলতাকে তুমি ছেড়ো না শীতলা।

শীতলা বলল—ছাড়বো না, কিন্তু যাবো কোথায় ওকে নিয়ে? গেরুয়ার নেশা ওর গেছে কেটে, পূজো-আস্রা করে কলের পুতুলের মতন, সন্ন্যাস আর ওকে তৃপ্তি দেয় না, গীতার শ্লোক পডতে গিয়ে ঘুম আসে… আমার কাছে কি 'ও থাকতে পারবে?

দেবদত্ত একটুখানি হাসল। বলল—সত্যি কথা একটি বলবো শীতলা? সুলতাকে তুমি এত ভালোবাসো শুধু এই জন্যেই। এই সব ধর্ম্মাচার, সন্ন্যাস, গেরুয়া, গীতা, তোমারও এতটুকু ভাল লাগে না! আমি জানি আর একদিন তুমি বলছিলে—

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দুই হাত দিয়ে শীতলা তার মুখ চেপে ধরল—চুপ কর, তুমি আমাকে পাগল করো না আলোক, তুমি জানো এ ছাড়া আমার অন্য গতি নেই, তুমি জানো……

দেবদত্ত থামলো না। নিজের মুখখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলতে লাগল

—হ্যাঁ জানি, জানি সব মেয়েরই মত তুমি চেয়েছিলে একখানি ঘর, একটি নিশ্চিন্ত নিভৃত সংসার, একটি ভালবাসার মানুষ, একটি সন্তান! তুমি শুধু চেয়েছিলে—

দেবদত্তর বুকের মধ্যে রুদ্ধ আবেগে শীতলার চোখ বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে এল। সে শুধু বলতে লাগল—চুপ কর আলোক, তুমি চুপ কর।

দেবদত্ত চুপ করল না, বলতে লাগল—তুমিও হলে সন্ন্যাসিনী, নিজেকে পুরুষ বলে তুমি আমার কাছে বক্তৃতা দিতে লাগলে, এর চেয়ে অবিচার আর কি হতে পারে! এই পাহাড় যেখানে দূরে মাঠে গিয়ে মিশেছে, তুমি চেয়েছিলে তারই কোনো অস্পষ্ট পথের ধারে বসে জীবনের গান গাইতে। তুমি মুক্তি চাওনি, চেয়েছিলে বাঁধন, তুমি সন্ন্যাস চাওনি, চেয়েছিলে জীবন-সংগ্রাম!—দেবদত্ত বলল—শীতলা, আত্ম-বঞ্চনায় ধর্ম্ম নেই!

দুজনেই মাঠের ওপর বসল। দেবদত্তর কাঁধের ওপর শীতলা মাথা রাখল। হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে' শীতলা বলল—নিজেকে এত ছেলেমানুষ আর কোনদিন মনে হয়নি!

কেন?

মুখ তুলে শীতলা দেখিয়ে দিল তার চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। একটুখানি হেসে সে আবার বলল—হৃদয়টা এখনও মরেনি, দেখছি। তাকে মারবার জন্যে এত চেষ্টা করলাম, এত অত্যাচার করলাম—উপবাস করিয়ে করিয়ে তাকে অচেতন করে' রাখলাম কিন্তু আজও দেখছি সে—

উত্তেজিত হয়ে দেবদত্ত বলল—তুমি আত্মহত্যা করচো, এ তোমার পাপ!

শীতলা আবার হাসল। বলল—দুটোই দিয়েছি মায়ের পায়ে বিলিয়ে, পাপ আর পুণ্য! এমন কি ইহকাল-পরকালও।

ওই মা? যে এমন নীচ, ইতর, হিংসুটে…

গুরুনিন্দা শোনা আমার অভ্যেস! কিন্তু আলোক, সত্যবানের প্রাণ যমরাজ ফেরৎ দেয়নি, অত দয়ালু যমরাজ নয়, সাবিত্রী তার ভালবাসার মানুষকে বাঁচিয়েছিল নিজের ইচ্ছাশক্তিতে।

তোমার মরা সন্ন্যাসিনী মাকে বাঁচাবে তাই দিয়ে?

সেটা ত আমার প্রতিজ্ঞা নয়, তপস্যা!

দুজনে উঠল—দেবদত্ত বলল—আমার কথা কি ভাবলে?

শীতলা বলল—ভেবেছি কোনো দিন?

তা জানি, কিন্তু আমার ত কোনো কাজ রইল না? দিন কাটবে কি নিয়ে?

শীতলা বলল—ঘুরে বেড়িও। মঠ-মন্দিরের অভাব নেই, নদীর জল আর গাছের ফল—সে আছেই।

আমি বলি, চল তুমি আমার সঙ্গে!

সে ত অনেকবার শুনেছি আলোক। যুগে যুগে কতবারই দেখা হল তোমার সঙ্গে। আমি ভেসেছিলাম স্রোতে, তুমি পথ হারিয়েছিলে ডাঙার ওপর; মেয়েরা ভেসে যায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে, পুরুষরা পথ হাতড়ে বেড়ায় অন্ধের মতন। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় ছাড়াছাড়ি হবার জন্যেই;—

দেবদত্ত বলল—তোমার পথ তাহলে বাঁধাই রইল—কেমন? মাকে আর এ জীবনে তুমি ছাড়বে না?

শীতলা বলল—এবারের মতন সেই ব্যবস্থাই ত করেছি! একটা জীবন এম্‌নি করেই না-হয় কাটালাম!

দেবদত্ত বলল—তোমার গলায় আওয়াজে বিদায়ের সুর শোনা যাচ্ছে শীতলা। কেন বল ত ?

শীতলা মুখ ফেরালো বোধ করি অশ্রু গোপন করতে। মুখ ফিরিয়েই বলল—এক জায়গায় অনেক দিন থাকার সৌভাগ্য ত আমার নেই। আবার যে বেরিয়ে পড়বার সময় হল !

কোথায় ?

শীতলা হাসল। বলল—ঠিকানা কি থাকে কোনোদিন ?

ও, আবার বুঝি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে ? কিন্তু আশ্রমের দায়িত্ব ?

রমা-দি আর মাইতি-গিন্নি—ওরাই ত চালায় আমরা না থাকলে !

দেবদত্ত বলল—আবার কি তীর্থের পথে যাবার ব্যবস্থা চলছে ?

শীতলা বলল—নৈলে আর যাবো কোথায় ? তীর্থই ত আমাদের লক্ষ্য !

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। দূরে চণ্ডীর পাহাড়ের ওপর দিয়ে এক সারি বক উড়ে যাচ্ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে একটি নিশ্বাস ফেলে দেবদত্ত বলল—দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি, যাওয়া যাক্—বেশ ত, তীর্থ করে' ফিরে এসো, আবার হয় ত দেখা হতে পারে! এখনকার মতন তা হলে—

শীতলা তেমনি হাসিমুখেই বলল—তোমাকে কেউ ছাড়লে তোমারও তাকে ছাড়তে দেরী লাগে না তা জানি !

দেবদত্ত বলল—তুমি কি চাও তৃতীয় শ্রেণীর প্রেমিকের মত তোমার আসন্ন বিরহে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে হা হুতোশ করব ?

শীতলা তার হাতটি ধরে' বলল—রাগ করলে আলোক ? তোমার কাজ রয়েছে যে !

কি কাজ ? তুমি গেলে আর আমার কোনো কাজ থাকবে না

শীতলা। আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে, তা মনে আছে ত? তোমার এই আশ্রমের হাওয়ায় আমার দম আট্‌কায়! সামান্য পাপ বৃহৎ পুণ্যকে নষ্ট করতে পারে! অত বড় আশ্রমটাকে বিষাক্ত করেছে তোমার মায়ের একটি কদর্য্য মনোভাব!

তা হোক্‌, তবু এসো একবার!

সে রাত্রিটি শুক্লপক্ষের; বোধ করি একাদশী তিথি। নিস্তব্ধ নিঃসাড় নিশীথিনী। জ্যোৎস্নার আলোয় দূরের পাহাড়গুলি যেন অটল স্তব্ধতায় ধ্যানে বসেছে।

একটি সূর্য্যমুখীর চারার পাশে দাঁড়িয়ে সুলতা কোন্‌দিকে যে তাকিয়ে ছিল এবং কি ভাবছিল তা শুধু সেই জানে! হয়ত ভাবছিল আবার কোন্ একটি বিচিত্র জীবনের অহ্বান তার কাছে এসে পৌছেছে! এমনি সময় শীতলা চুপি চুপি পিছন দিক থেকে এসে তার চিবুকটি নেড়ে দিয়ে ডাক্‌ল—প্রিয়তমা?

সুলতা মুখ ফিরালো। বলল—শীতলা-দি, তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলাম। মা নিজের মহল ছেড়ে এদিকে আর আসবেন না, তোমাকে তিনি এক্ষুনি ডাকতে পাঠিয়েছেন।

কারণ?

কারণ তিনি ত কাউকে বলেন না! তবে বোধ হচ্ছে তিনি যেন কোথাও যাবার চেষ্টায় আছেন। পোঁট্‌লা-পুট্‌লি—

ও, তাই নাকি? একেবারে এত তাড়াতাড়ি? আমি ভেবেছিলাম —শীতলা চিন্তিত মুখে কিয়ৎক্ষণ সুদূর জ্যোৎস্নালোকের দিকে তাকালো। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল—আচ্ছা সুলতা?

সুলতা একবারে তার কোলের কাছে স'রে এসে দাঁড়াল। শীতলা বলল—একটি ছবি তুই মনে মনে ভাবতে পারিস? ধর্ কোনো নদীর ধারে একখানি পাতার ঘরে দুটি ছেলে মেয়ে থাকে…চারিদিকে গভীর জঙ্গল, মানুষের চিহ্নও কোথাও নেই…ছেলে মেয়ে দুটির একা দিন কাটে। ছেলেটি খাবার সংগ্রহ ক'রে আনে, মেয়েটি আনে জঙ্গল থেকে কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে। ছেলেটি গান গায়, মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে শোনে…নদীর চড়ায় ছুটোছুটি ক'রে তাদের সারাদিন কাটে, জঙ্গলের মধ্যে তারা লুকোচুরি খেলতে যায়! রাতে তাদের পাতার ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো ঢোকে, দুজনে পাশ-পাশি শুয়ে একটি একটি ক'রে আকাশের তারা গোণে…নিশ্চিন্ত, নিভৃত দুটি সহজ জীবনের খেলা! সুলতা ভাবতে পারিস?

সুলতা রুদ্ধকণ্ঠে বলল—দিদি—

শীতলা বলল—ধর্ যদি তোর এমন দিন আসে যে দিন তুই সমস্ত দুঃখের তপস্যার শেষে একটি ভালবাসার মানুষ পেয়েছিস্—ওরে, ওরে তোদের কেমন ক"রে বোঝাবো, একজনকে, একটিমাত্রকে ভাল-বাসা জীবনের কতখানি সুখ!

শীতলা ছুটে সেখান থেকে চলে গেল। চলে' যাবার পরেই দেখা গেল দেবদত্ত এইদিকেই এগিয়ে আসছে। সুলতা একটু স'রে দাঁড়িয়ে বলল—আপনি যে ফিরলেন আবার দেবদত্তবাবু?

কি করি বল! তোমার শীতলা-দি আবার নিয়ে এলো টেনে-হিঁচড়ে! টানা-হেঁচড়াই ত চলছে সারা জীবনটা!

বেড়ার মাঝখানে ফুলের বাগান। চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, যুঁই ফুলের গন্ধে চারিদিক ভুর ভুর করছে। ফুলদার একখানি মখমলের আসন এনে পেতে দিয়ে সুলতা বলল—বসুন।

আসনের ওপরে এসে বসে পড়ে' দেবদত্ত বলল—বড় তেষ্টা পেয়েছে সুলতা। সারাদিনের রোদ গেছে আজ মাথার ওপর দিয়ে; ঘণ্টা চারেক আগে মনে করেছিলাম এক ঘটি জল খাবো।

সুলতা তাড়াতাড়ি জল ও মিষ্টান্ন এনে দিল। বলল—আজ আর কোথাও আপনার গিয়ে কাজ নেই, বিছানা করে' দিই, খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন।

আসনের ওপর বসেই খুঁটিতে হেলান দিয়ে দেবদত্ত বলল—বেশ লাগছে, আজকের রাতটা যেন মনোহর মৃত্যুর মতন।

সুলতা হাত তিনেক দূরে অনুগত শিষ্যার মত আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছিল।

দেবদত্ত বলল—বহুকাল ধরে' ভুলে গিয়েছিলাম, আকাশে উঠে চাঁদ, গাছে ফোটে ফুল! আচ্ছা সুলতা, আমার সঙ্গে শীতলাকে দেখে তোমার কি কিছু মনে হয় না?

সুলতা বলল—আপনি যে শীতলা-দিকে ভালবাসেন!

ভালবাসা! ভালবাসার নিয়ম কি এ আশ্রমে আছে নাকি? বিশেষ করে নরনারীর—

সুলতা বলল—আমি এর মধ্যে কিছু অন্যায় দেখিনে দেবদত্তবাবু।

দেবদত্ত খানিকক্ষণ চুপ করে' রইল। তারপর বলল—সত্যি আমি শীতলাকে ভালবাসি সুলতা, এর চেয়ে বড় সত্যি আমার জীবনে আর হয়ত নেই। আজ অবধি বহু নারীর সঙ্গে বহু সম্বন্ধ পাতিয়েছি কিন্তু শীতলার সঙ্গে আমার অন্য কথা! ও হচ্ছে আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু। আমার ভাবের বন্ধু! সংসারে আমাদের দুজনের জীবন যে সমান মিথ্যে হয়ে গেছে, শীতলা আমার সেইখানকার বন্ধু।

শীতলা ফিরে এল অনেক রাতে। ছিম্‌ছিমে চাঁদের আলোয় তার

অস্পষ্ট দেহলতাটি এঁকে বেঁকে এসে দেবদত্তর পাশে দাঁড়াল। কথায় কথায় এই দুটি নরনারী এতক্ষণ এমনিই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন তারা টের পায়নি। শীতলা হেসে বলল—বেশ, 'মিলনে নিখিল-হারা', কেমন ?

দুজনেই মুখ তুললো। চাঁদের আলোয় শীতলাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দুদিকেই হেসে হেসে তাকাতে লাগল।

দেবদত্ত বলল—তাহলে সুলতার যাত্রার দিন কবে ঠিক হলো শীতলা ?

জবাবটা সুলতাই দিল—হয় কাল, নয়ত পরশু—শীতলা-দিকে এখান থেকে ছাড়াতেই যা দেরী লাগবে !

মনে মনে এবার দেবদত্ত একটু না হেসে থাকতে পারল না। বলল —তুমি কি মনে কর, শীতলা তোমার সঙ্গে—?

তবে ?—সুলতা ফ্যাল ফ্যাল করে' শীতলার দিকে তাকালো। নির্ব্বিকার একটি স্নিগ্ধ হাসিতে শীতলার মুখখানি তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে-হাসি কেবল এই কথাই বলে, জীবনের সকল বন্ধনকেই সে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

দেবদত্তও হাসল। বলল—তোমার যেখানে বাস, শীতলার বাসা সেখান থেকে অনেক দূরে। পথটাও এক নয়, যাতায়াতে কেবল দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

সুলতা উঠে এল। শীতলার হাত দুটি কোলের মধ্যে নিয়ে মুখের কাছে মুখ তুলে বলল—দেবদত্তবাবু যা বললেন তা সত্যি ?

শীতলা বলল—দেবদত্ত ত মিছে কথা বলে না ভাই।

আমি তবে যাবো কার সঙ্গে ?

শীতলা চোখের জল গোপন ক'রে বলল—তাই ত ভাবছি,—বলে' সে সরে' এসে দেবদত্তর কাছে দাঁড়িয়ে বলল—ওঠো একবার আলোক নাথ, শেষ হবার আগে যেটুকু বাকি আছে সেটুকু শুধু কর্ত্তব্য নয়, সেটি আমার কাজ। এসো উঠে এসো।

দেবদত্ত মুখ তুলে তাকালো। শীতলা বলল—ভয় হচ্ছে পাছে কোনো চমক লাগাই, কিম্বা কোনো ভোজবাজীর ধোঁকা দিই—মানুষকে হঠাৎ স্তম্ভিত করে' দেয় এমন কোনো কাজকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

তবু বিস্ময়ের কিছু ছিল বৈকি! সুলতা হতচকিত হয়ে গেল।

দেবদত্ত বলল—গলার আওয়াজ তোমার ধরে' এল মনে হচ্ছে? শীতলা, যে ঘটনাটা তুমি তৈরী করছ সেটা এখন আমার কাছে আর দুর্ব্বোধ্য নয়, আগে থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

চোখের জল চোখেই ছিল, শীতলা একটুখানি হাসল। বলল—এ ছাড়া অন্য পথ আমার জানা নেই আলোক। যে ক'জন আমরা এক-সঙ্গে মিলেছিলাম, আমাদের সম্বন্ধে এর চেয়ে স্বাভাবিক পরিণতি আর কে ভাবতে পারত বল ত? অন্য যে-কোনো বিচার হতো আমাদের পক্ষে অবিচার!

দেবদত্ত উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুলতার হাতটি টেনে নিয়ে দেবদত্তর ডান হাতের সঙ্গে মিলিয়ে শীতলা বলল—ফুটো জাহাজের মাস্তলের ওপর বসলো ঝড়ের পাখী—এর প্রতিবাদ আর চলে না। বিধাতার রাজ্যে বিশৃঙ্খলার আর শেষ নেই কিন্তু তবু যেন কোথায় একটি ঐক্য আছে। ঐক্য একটি আছে বলেই তাঁর রাজত্বে রোজ রোজ প্রলয় হয় না, রোজ একটা করে' মহামারী দেখা দেয় না!

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুলতা ও দেবদত্ত তার দিকে তাকিয়ে ছিল !

শীতলা বলতে লাগল—দুটো জীবনের যত ভাঙাগড়া, যত গোলযোগ সমস্তই আজ এই দুটো হাতে এসে মিললো। এ তোমাদের মিলন নয়, প্রেম নয়—এ হচ্ছে প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মানুষের নয়, মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর, নৈলে এত বড় নাটকের উদ্দেশ্য মিথ্যে হয়ে যাবে। দেবদত্ত, তোমারই কাছে এসে পৌছুবার জন্যে সুলতার এতখানি দুঃখের তপস্যার দরকার হয়েছিল।

সুলতা যেন কি বলতে গেল, শীতলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—এযা করলাম ভাই, এ তোর দিদির কার্য্যতঃ আশীর্ব্বাদ, ফাঁকা কথার উৎসাহ দিয়ে মেয়েদের স্বাধীন বলে' ত ছেড়ে দিতে পারিনে।

কিন্তু দিদি—

বুঝেছি, তবু চাই আশ্রয়। মেয়ে জাতকে তোর ভেতর দিয়ে যেমন বুঝতে পারলাম, এমন আর কিছুতে নয়। তাই ত বলছি আশ্রয় চাই, একজনকে না ধরলে তোর চলবে না!—দেবদত্ত? কথা বলছ না যে? ঘাড় হেঁট করে রইলে কেন?

দেবদত্ত সোজা হয়ে বলল—এর পরেও মাথা তুমি তুলতে বল? তুমি জানতে মেয়েদের ভার আমি বইতে পারিনে। এত জেনেও তুমি—

তোমাকে ত ভার দিই নি আলোক, তুমি দেখাবে পথ, সুলতাকে দিলাম তোমার ভার! দায়িত্ব না নিলে সুলতা ত দাঁড়াতে পারবে না!

কিন্তু নিজে যে পথ জানে না তাকে—

এবার কি নালিশ জানাবার পালা?

দুজনেই পরস্পর মুখের দিকে তাকালো, এবং সুলতার দৃষ্টির সুমুখেই দুজনের মুখ বিমল হাসিতে মুহূর্ত্তের মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

আজ আর একবার তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে শীতলার পায়ের ধুলো নিয়ে সুলতা ভিতরে চলে গেল। মনে হল, কথা বলার শক্তি আর তার ছিল না।

তার পথের দিকে একবার তাকিয়ে দেবদত্ত বলল—কোথায় গেল বলতে পারো?

শীতলা বলল—পারি। এ-জীবনের মত বোধ হয় আজ ও নিশ্চিন্ত হল। এবার গেল মনের আশা মিটিয়ে কাঁদতে। সমস্ত রাত আজ ও চোখের জল ফেলবে! আনন্দের অসহ্য যাতনায় ওর ত আজ ঘুম আসবে না।

নির্ব্বাক দুজনে পাশাপাশি বসে রইল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ তেমনিই তাদের চোখে ভাসতে লাগল তেমনি করেই মন্থর বাতাসে দুলতে লাগল সূর্য্যমুখী ও রজনীগন্ধার চারাগুলি। তারাও যেন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলছে, এই ভাল হল!

দেবদত্ত মুখ ফিরিয়ে চিন্তিত মুখে শীতলার দিকে তাকাল, তারপর বলল—কি বল ত? কি যেন হয়ে গেল শীতলা?

শীতলা নিঃশব্দে হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে সে অন্যদিকে ঘাড় ফেরালো, তখনো দেখা গেল, সর্ব্বাঙ্গে তার হাসির ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

দেবদত্ত ধীরে ধীরে ডান্ হাতটা বাড়িয়ে তার মাথাটি শক্ত ক'রে টিপে ধ'রে এদিকে ফেরালো, পরে দুটি একাগ্র দৃষ্টি শীতলার মুখের ওপর স্থাপন ক'রে স্থির হয়ে রইল।

হাসো, দেখি?

শীতলা হাসতে লাগল নীরবে।

আবার হাসো?

আবার শীতলা হাসতে লাগল। নিজের গলার কাছে হাত বুলিয়ে ঢোক গিলে তার পাগলের হাসি আর থামে না।

দেবদত্ত বলল—এবার কিন্তু আট্‌কে যাচ্ছে—নিশ্চয়ই সহজ ক'রে আর হাসতে পাচ্ছ না শীতলা! হাসো?

এবার উঁচু গলায় জোরে হাসতে গিয়ে শীতলার মুখের ভিতর থেকে যেন একটি শরাহত রক্তাপ্লুত পক্ষিশাবক আর্ত্তনাদ ক'রে বেরিয়ে এল, এবং সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই অশ্রুজলে চুরমার হয়ে সে দেবদত্তর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়ল।

শেষরাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। ভোর হতে তখনো অনেক দেরী, চন্দ্রালোক সবেমাত্র পাণ্ডুর হতে সুরু হয়েছে। রাত্রির রহস্যময় প্রশ্ন চোখে নিয়ে আকাশের শিয়রে শুকতারাটি জ্বল জ্বল করছে।

সুলতার নিদ্রিত দুটি আঁখিপল্লব ধীরে ধীরে খুলে গেল। মাথার কাছে আলোটি বোধ করি একটু আগে নিবে গেছে এবং তারই ওপর দিয়ে জান্‌লার চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখের ওপর। মুখ ফিরিয়ে সে তাকালো ঘরের মধ্যে, পরে নিদ্রাজড়িত চোখ দুটি টেনে টেনে বলল—আপনি? বসে রয়েছেন?

দেবদত্ত বলল—তুমি জাগবে তাই বসে আছি।

শীতলা-দি ছিল যে আপনার কাছে?

হ্যাঁ, সে চলে গেছে!

চ'লে? ও, আমায় ডাকল না একবার?

তোমার চোখে জল সে আর দেখতে চাইল না!

সুলতা খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে থেকে বলল—চলে গেছে! অত রাতে...কেউ জান্‌ল না...

তার চোখ আবার ঘুমে জড়িয়ে এল !

কিয়ৎক্ষণ পরেই সে উঠে বসল। জান্‌লা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, রাত শেষ হয়ে গেছে, আর তারই দিকে ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেবদত্ত বসে রয়েছে।

সকল ব্যবস্থাই ছিল, ঘুরে প্রস্তুত হয়ে সে যখন এসে দাঁড়াল দেবদত্ত উঠে তার সঙ্গে বেরিয়ে এল। আশ্রমের সবাই তখন নিদ্রিত।

আশ্রমের সীমানা পার হয়ে তারা মাঠে নামল, তারপর চললো মাঠ পার হয়ে পাহাড়ের দিকে। কারো মুখেই কোনো কথা নেই, কথা বলার আর কোনো কারণও ছিল না। চলতে চলতে তারা পাহাড়ের ধারে এল। এই পাহাড় পার হয়ে নদীতীর ধ'রে বহুদূর চলে' গেলে শালের জঙ্গলের কাছেই দেবদত্তর পাতার ঘর !

সুলতার একটি হাত ধরে দেবদত্ত নাথের পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। পথটা খুব সুগম নয়, কাপড় চোপড়ে সুলতার লাগল কাঁটাখোঁচা, গায়ে লাগল ছড় ও কাদা মাটীর দাগ,—পথশ্রমে তার কপালের ওপর ঘামের বিন্দু জমে উঠল।

সূর্য্যোদয়ের ঐশ্বর্য্যে সমস্ত আকশটা হয়ে উঠল রাঙায় রাঙা। ঘাসের ওপর শিশিরের ফোঁটায় লাগছে সেই আলোর আভাস। পাহাড়ের চূড়ার ওপর উঠে দেবদত্ত একবার নিঃশব্দে দাঁড়াল, তারপর দূর পূর্ব্বদিকে মুখ ক'রে পা মুড়ে ব'সে প্রভাত সূর্য্যকে প্রণাম করবার জন্য মাথা হেঁট করল। সুলতাকে কিছুই বলতে হল না, পাশে এসে বসল, তারপর প্রণাম লুটিয়ে দিল একেবারে সাষ্টাঙ্গে। হেমন্তের প্রাতঃকাল তখন কুয়াসাচ্ছন্ন।

মনে হলো তাদের সে প্রণাম কোনো দেবতার প্রতি, কোনো ধর্ম্মের প্রতি, কোনো স্বর্গের প্রতি নয়,—সে প্রণাম উড়ে' উড়ে' চললো শুধু অসীম অনন্ত শূন্যলোকের দিকে উধাও হয়ে।

দেবদত্ত উঠে সুলতার হাতখানি আবার ধ'রে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগল।

চৌদ্দ

শীতের শেষ দিকটায় সুদূর দক্ষিণ দেশে কোনো এক দুর্গম তীর্থের পথে দুটি নারীকে দেখা গেল। উপলখণ্ডময় কোনো একটি অখ্যাত শীর্ণ নদীর পথে তারা চলেছিল। নদীটির চর জেগে উঠেছে, এপার ওপার বালি ধু ধু করছে। এই নদী তাদের পার হতে হবে।

শীতলা আগে আগে আর মা পিছনে পিছনে—

শীতলা মুখ ফিরিয়ে তাকালো; মায়ের দিকে নয়—ওপারে! অনেকটা পথ এসেছে বটে কিন্তু আরো যে অনেকখানি!

মা ডাকলেন,—শীতলা?

কেন মা!

জল কি আর নেই?

আছে বৈকি, আপনার জন্যে জল আমার সঙ্গেই থাকে।—ব'লে শীতলা থম্‌কে দাঁড়িয়ে হাতের কমণ্ডলু বাড়িয়ে মায়ের অঞ্জলীতে জল ঢেলে দিল, মা তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।

এ নদী পার হতে হবে শীতলা?

নৈলে ত সমুদ্র যাত্রার পথ খুঁজে পাব না মা।

মা বললেন—তোমার কি তেষ্টা লাগছে না?

শীতলা করুণ হাসি হাসল। হেসে বলল—ওটা ভুলেই গেছি।

ছায়া ও আশ্রয়লেশহীন শুকনো চড়ার দিকে তাকিয়ে মা বললেন—এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে যাবে?

তীর্থে পৌঁছবার আগে ত বিশ্রাম নেই মা!

ও, আচ্ছা চল তবে।

নদী পার হয়ে চলে' যাবার সময় দুইটি শ্রান্ত পথবাসিনী নারীর মাথার উপর ধীরে ধীরে গোধূলি-ম্লান সন্ধ্যা নেমে এল।